# ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ

## একটি সর্বনাশা পদক্ষেপ

"একটি নিরাপদ সেনাবাহিনী নিরাপদ সীমারেখার চেয়ে অনেক ভাল।"

ড. বি. আর. আম্বেদকর।

শ্রীদেবজ্যোতি রায়

## পাণ্ডুলিপি পড়ে যারা এই নিবন্ধের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন —

শ্রীমৎ স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ (কার্তিক মহারাজ), অধ্যক্ষ, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।

ড. বি. আর. আম্বেদকর স্টাডি সার্কেলের (বামনগাছি, উ. ২৪ পরগনা) পক্ষে সভাপতি শ্রীরত্নেশ্বর সরকার, অ্যাসোসিয়েট গভর্ণমেন্ট প্লিডার (সিনিয়ার), জাজেস্ কোর্ট, বারাসাত; ডা. হরিপদ সিকদার (প্রচার সম্পাদক), শ্রীকমলাকান্ত বণিক (লেখক), শ্রীজগদীশচন্দ্র হালদার এবং শ্রীমাণিকলাল রায়। ● ভারতীয় মুক্ত সমাজের (কলকাতা- ৮৩) পক্ষে শ্রীস্বপন কুমার দাস, (আহ্বায়ক), শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং শ্রীমতী শিখা সরকার। ● 'ক্যাম্ব' [Campaign Against Atrocities on Minorities in Bangladesh]-এর পক্ষে শ্রীমোহিত রায় (অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং শ্রীচয়ন রায়। ● ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিষ্ট ফোরামের (কলকাতা-৫৪) পক্ষে শ্রীগোপাল কৃষ্ণ সাহা, অ্যাডভোকেট, কলকাতা হাইকোর্ট। ● হিন্দু সংহতির পক্ষে শ্রীচিত্তরঞ্জন দে (সম্পাদক, হিন্দু সংহতি) এবং শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস (প্রকাশক)। কলকাতা-১২। ● বারাসাত ভাগবত সমাজের (নতুন পুকুর, বারাসাত, উ. ২৪ পরগনা) পক্ষে প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শ্রীসদানন্দ দেবনাথ (চঞ্চল)। ● শ্রীবীরেন্দ্র কুমার ভৌমিক, অ্যাডভোকেট, কলকাতা হাইকোর্ট এবং সম্পাদক, ও-বি-সি সংবাদ, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা- ৯। ● শ্রীকুমুদ রঞ্জন বিশ্বাস, অ্যাডভোকেট, জাজেস্ কোর্ট, বারাসাত, কলকাতা-১২৪। ● ডা. হরিপদ রায়, সমাজসেবী, অবসরপ্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার, কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট, নিউ পর্ণশ্রী, কলকাতা-৬০। ● অধ্যাপক সন্তোষ কুমার রায়, মানকুণ্ডু, হুগলী। ● শ্রীসুজিত কুমার সিকদার (সমাজসেবী), ডায়মণ্ড পার্ক, কলকাতা-১০৪, শ্রীমন্মথ বাছাড়, আড়বেলিয়া, বাদুরিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা। ● শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ রায় (অ্যাডভোকেট), সাংগঠনিক সম্পাদক, এ-ভি-পি-আই, বারাসাত, কলকাতা-১২৪। ● শ্রীঅমিয় কুমার ব্যানার্জী (রাজনৈতিক চিন্তাবিদ), উত্তর পাড়া, হুগলী। ● শ্রীদিলীপ কুমার সরকার (সমাজসেবী), রামলাল বাজার, কলকাতা-৭৮। ● শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত (লেখক), লাবনী, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪। ● শ্রীঅশোক পাল চৌধুরী, প্রাদেশিক কার্যকর্তা, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ, বাদু, কাঠোর, কলকাতা -১২৮। ● শ্রীতপন কুমার বিশ্বাস, সম্পাদক, 'ওম গাণ্ডীব', মালিপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ● শ্রীবাচ্চা লাল যাদব, সাধারণ সম্পাদক, শ্যামাপ্রসাদ মেমোরিয়াল সোসাইটি, কলকাতা- ৭০০ ০৫৪।

# ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ
# একটি সর্বনাশা পদক্ষেপ

শ্রীদেবজ্যোতি রায়

শ্রীদেবজ্যোতি রায়ের —

# ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ ঃ একটি সর্বনাশা পদক্ষেপ

**Dharmer Bhittite Sanrakshan:**
**Ekti Sarbanasha Padakshep**

[Reservation on the Basis of Religion: A Destructive Decision]

By Shri Debajyoti Roy


প্রকাশক ঃ তপন কুমার ঘোষ
৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ ৩০ এপ্রিল, ২০১০
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জানুয়ারি, ২০১৪





কম্পোজ ঃ শ্রীবিকাশ কুসুম রায়

মুদ্রণে ঃ মহামায়া প্রেস এণ্ড বাইণ্ডিং
৩০/৬/১, মদন মিত্র লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

বিনিময় ঃ ২০.০০ টাকা মাত্র

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট,
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট,
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

শ্রীশ্যামল রায়
বারাসাত রেলওয়ে বুক-স্টল
কলকাতা - ৭০০ ১২৪
ফোন- ৯৮৩০৬৫২৪৬৯

হিন্দু সংহতি
৫, ভুবন ধর লেন,
কলকাতা - ৭০০ ০১২
ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮

# ভূমিকা

অতীব আগ্রহ ও যত্ন সহকারে শ্রীদেবজ্যোতি রায়ের এই ছোট্ট অথচ মূল্যবান গ্রন্থটি পড়লাম। এর আগেও তাঁর অনেক লেখাই আমি পড়েছি এবং মতামত জানিয়েছি, শুভেচ্ছা জানিয়েছি। ঐ লেখাগুলো যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা স্বীকার করবেন শ্রীরায় সেই বিরল দেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্ব যিনি বহু পরিশ্রম করে দু'চোখ খোলা রেখে নির্মোহ গবেষকের নীতি মেনে লেখেন। পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে যে ক'জন বাঙালি লেখক মুসলিম ধর্মশাস্ত্র এবং ভারত রত্ন বাবাসাহেব ড. আম্বেদকরের চিন্তাধারা নিয়ে চর্চা করছেন আমার দৃষ্টিতে তাঁদের মধ্যে দেবজ্যোতিবাবুর আসন প্রথম দিকে।

প্রাকৃতিক এবং জনসম্পদে ভরপুর ভারত আজ কেন 'ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ' নামক তাবিজ বিতরণ করে বাঁচতে চাইছে, আলোচ্য পুস্তকে তার কারণ এবং এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে শ্রীরায় তাঁর মতামত ব্যাখ্যা করেছেন। কেন চীন এবং রাশিয়া থেকে কমিউনিজম মুছে যেতে বসেছে, কেন ভারতের কমিউনিষ্টরা ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন, মুসলিম লীগের জন্মলগ্ন থেকে কংগ্রেস কেন মুসলিম তোষণ শুরু করেছে, তার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ বিশ্লেষণ করছেন শ্রীরায় তাঁর বিভিন্ন মূল্যবান লেখায়। এই তোষণ বন্ধ না করলে যে ধ্বংসাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হবে তাও সাহসের সঙ্গে বলেছেন তিনি। মেধার বিচারে তিনি ড. আম্বেদকরের যোগ্য ছাত্র এবং সাহসিকতার বিচারে তিনি বাবাসাহেবের সার্থক অনুগামী।

আমার জানা মতে মুসলিম রাজনীতি, মুসলিম তোষণ এবং হিন্দুধর্মের দুর্বলতার বিরুদ্ধে অন্যতম সাহসী এবং যুক্তিপূর্ণ যোদ্ধা ছিলেন ড. আম্বেদকর। তাঁকে সার্থক ভাবে অনুসরণ করছেন দেবজ্যোতিবাবু। বর্তমান লেখাটি যাঁরাই পড়বেন, তাঁরাই এ কথা স্বীকার করবেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যুক্তিবাদী সব মানুষের এই বইটি ভাল লাগবে বলে আমি বিশ্বাস করি; বিশেষত বর্তমানে দেশ যে আত্মধ্বংসী পথে এগিয়ে চলেছে, তার প্রেক্ষিতে।

এই লেখাটি সহ শ্রীরায়ের সব লেখাগুলি সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে দেওয়াই হবে এক মহান জাতীয় কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনের জন্য আমি দেশপ্রেমিক ভারতবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছি। লেখক শ্রীরায় এবং প্রকাশক শ্রীতপন ঘোষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জগদীশ্বর তাঁদের মঙ্গল করুন। জয় ভারত।

এপ্রিল ২০, ২০১০

স্বাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সিংহ, এম.এ., পি.এইচ.ডি.
অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি রেজিস্ট্রার,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

# লেখকের নিবেদন

কলেজ জীবনে মার্কসবাদ ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতির সমর্থক ছিলাম। সেদিন কেন যেন বুঝে বসেছিলাম যে, 'সাম্রাজ্যবাদ' এবং 'পুঁজিবাদ' ধ্বংস না করে এবং তার সঙ্গে 'ধর্মপ্রাচীরের কারা' না ভাঙতে পারলে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মুক্তি আসবে না। মার্কসবাদই একমাত্র অস্ত্র যার দ্বারা এ সব জঞ্জাল সাফ করে মুক্ত সমাজ গড়া সম্ভব; মানুষের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। পরে ১৯৬৪-তে কবি গোলাম মোস্তফা রচিত 'ইসলাম ও কমিউনিজম' শীর্ষক বইটির তৃতীয় সংস্করণ পড়ার সুযোগ ঘটে। বইটির ১০৪ নং পৃষ্ঠায় লেখক বলেছেন, "এ কথা দৃঢ়তার সহিতই বলা যায় ঃ ইসলামের নিকট কমিউনিজমকে আত্মসমর্পণ করিতেই হইবে। ইসলামইজমই হইবে কমিউনিজমের শেষ পরিণতি।" ১১৩ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন, "জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক কমিউনিজম ইসলামের পথেই অগ্রসর হইতেছে।"

বইটি পড়ে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নেতারা আমাদের বলেছিলেন, মন খারাপ করবে না। দেশ-ভাগের পরে মোস্তফা সাহেব মৌলবাদীদের হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছেন। তাই 'আবোল-তাবোল' লিখছেন। তোমরা নিশ্চিত জেনে রাখো ইসলাম সহ সব ধর্মকেই কমিউনিজমের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গে শুরু হল মুক্তি সংগ্রাম। ধর্মীয় মৌলবাদী বর্বর ইয়াহিয়া খান নিজের দেশে গণহত্যা শুরু করেন। সঙ্গে অগ্নি সংযোগ, লুঠপাট এবং নারী ধর্ষণ। দেশের উভয় অংশের হাজী-মোল্লা-মাওলানা এবং ইমামদের শতকরা ৯০ ভাগ দু'হাত তুলে ইয়াহিয়াকে সমর্থন জানায়। মাস তিনেক পরে ইয়াহিয়া মুসলমানদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ভারত অর্থ, অস্ত্র এবং রক্ত দিয়ে বাংলাদেশকে সাহায্য করে। সেদিন রাশিয়া দাঁড়ায় ভারতের পাশে; কিন্তু 'সর্বহারার মহান নেতা মাও সে তুঙ' দাঁড়ালেন গণহত্যার নায়ক ইয়াহিয়া খানের পাশে। প্রতিদিন তিনি টন টন অস্ত্র দিতে শুরু করেন পাকিস্তানকে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কমিউনিষ্ট চীন মৌলবাদের অন্যতম সুতিকাগার পাকিস্তানের পাশেই আছে। রাশিয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সেখানে বিজয়ীর বেশে ইসলাম দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ চীনের কমিউনিষ্ট সরকার আমেরিকার অর্থনীতিকে রুদ্রাক্ষের মালা করে মার্কসবাদের কবর খুঁড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ভারতের কমিউনিষ্টরা প্রকাশ্যে আজ আর ধর্মকে আফিম বলেন না। ইসলাম ধর্মকে তো 'প্রায় অমৃত' বলে চিহ্নিত করেছেন। এই 'অমৃতকুম্ভধারী' ইমাম সাহেবরা বলে দেবেন কাকে ভারতে রাখা হবে, আর কাকে ভারত থেকে বের করে দেওয়া হবে। যদি কোন ইমাম প্রকাশ্য কাউকে খুনের ফতোয়া দেন, তাহলে তা দোষের হবে না।

এই সেদিনও কমরেড জ্যোতিবাবু-বুদ্ধদেববাবুরা বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে কোন ও-বি-সি নেই। কিন্তু রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পরে কলকাতার ইমাম সাহেবরা এবং মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা যখন বললেন, ও-বি-সি টো-বি-সি বুঝি না, রাজ্যের

সকল মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ চাই, বুদ্ধদেববাবু তখন 'শ্যাম এবং কুল' রাখার তত্ত্ব অনুসারে বললেন, পশ্চিমবঙ্গে আড়াই কোটি মুসলমানদের ২ কোটিকে (যাদের মাসিক আয় ৩৭, ৫০০ টাকা পর্যন্ত) ও-বি-সি কোটায় নিয়ে আসা হবে। এরই সঙ্গে বুদ্ধবাবু প্রায় প্রতিদিন সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রী এবং তাঁর বিচারে গরীব গুর্বো মুসলমানদের হাতে টাকার থলি ধরিয়ে দিচ্ছেন। ১০.৪.২০১০ তারিখে মালদহ গিয়ে ৫০ হাজার মুসলিম পরিবারকে ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে বাড়ি বানিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলেন। কিন্তু কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত পণ্ডিত এবং বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হিন্দুদের সম্পর্কে একটি কথাও বলছেন না।

এই সেদিনও তিনি বলেছিলেন, সংবিধানে সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণ দেওয়ার কোন বিধান নেই। এখন বলছেন, তপশিলী জাতি-উপজাতির ছেলে মেয়েরা সংরক্ষণের সুযোগ পেলে মুসলমান ছেলে-মেয়েরা কেন পাবে না? বুদ্ধবাবু হয়ত ভুলে গেছেন শত শত বছর ধরে তপশিলী জাতি উপজাতির মানুষেরা সামাজিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভাবে নির্যাতিত হয়ে আসছিলেন, তা প্রতিষ্ঠিত সত্য। আদিবাসী বলে পরিচিত হিন্দুরা আজও পোকা মাকড় খেয়ে আক্ষরিক অর্থেই মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ভারতে কিছু সংখ্যক মুসলমান দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছেন, এ কথা ঠিক। কিন্তু তাদের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক হিন্দু দারিদ্র্য সীমার নীচে আছেন। আর একজন মুসলমানও সামাজিক বা রাজনৈতিক ভাবে বঞ্চিত নন। তারা নিজেদের 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মের অনুসারী' বলে মানসিক দিক থেকে অপার শান্তির অধিকারী।

মণ্ডল কমিশন মুসলমানদের কয়েকটি গোষ্ঠীকে তো আগেই ও-বি-সি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আমরা মনে করি তা-ই যথেষ্ট। কিন্তু এখন যা শুরু হয়েছে, তা নিছক তোষণ, যা ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া কিছুই নয়। এর ফলে যা আসবে তা নিছক ধ্বংস। এই ধ্বংসের পূর্বাভাষ দিয়ে গেছেন ভারতরত্ন বাবাসাহেব ড. আম্বেদকর তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি 'পাকিস্তান অর দি পার্টিশন অব ইণ্ডিয়া'-য়। তাঁর চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে এই পুস্তিকা রচিত হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ এবং বিভিন্ন ভাবে উৎসাহ জুগিয়ে যাঁরা সাহায্য করেছেন এবং পাণ্ডুলিপি পড়ে যারা আমাদের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন, তাঁদের সকলের কাছে, বিশেষ ভাবে স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজের (কার্তিক মহারাজ) এবং প্রকাশক তপন ঘোষের কাছে কাছে আমি ঋণী; তাঁদের কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব। কলাম লেখক এম এ সফিউল্লা এবং শিক্ষক গিয়াসুদ্দিনের লেখা থেকে তথ্য নিয়েছি। আমরা তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞ।

এই পুস্তিকায় আমরা অপরিবর্তনীয় কোন কথা লিখিনি। কোথাও কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি থাকলে পরবর্তী কালে তা শুধরে নেব অবশ্যই। আপনারা নিরপেক্ষভাবে ভেবে দেখুন ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ ভারতের ধ্বংস ডেকে আনবে কি না। বিনীত —

এপ্রিল ২৫, ২০১০। শ্রীদেবজ্যোতি রায়।

১০.০৪.২০১০ তারিখে মালদহের একটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু পশ্চাদপদ গৃহহীন সংখ্যালঘুদের হাতে 'আমার বাড়ি' প্রকল্পের নথি, সংখ্যালঘু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি এবং সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের হাতে ঋণ তুলে দিয়ে বলেন, "চাকরি ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি, উপজাতিদের যদি সংরক্ষণ থাকে তাহলে মুসলিমদেরও সংরক্ষণ থাকাটা প্রয়োজন।"

(আনন্দবাজার, ১১.৪.২০১০, পৃ-৫)

ধর্মের ভিত্তিতে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের জন্য শতকরা ১০ ভাগ সংরক্ষণের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন একদা 'ধর্ম জনগণের আফিম' তত্ত্বে অর্থাৎ নাস্তিক্য মতবাদে বিশ্বাসী, প্রগতিশীল, গণতন্ত্রী ও সংবেদনশীল মুখ্যমন্ত্রী কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। না, তিনি একা নন, আমাদের 'চোখের মণি' তথা প্রগতিশীল রাজ্য সরকারে অংশগ্রহণকারী সব বামপন্থীরাই এই চরম অশুভ কম্মটির অংশীদার। কম্মটি শুধু অশুভই নয়, আজকের ভারতকে মুসলিম ভারতে পরিণত করার 'নিশ্চিত পদক্ষেপ' এটি। কমিউনিস্ট নামধারী মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লার বিচারে পশ্চিমবঙ্গের সব মুসলমানরাই দুঃস্থ। নাখোদা মসজিদ ও টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম সাহেবরাও দুঃস্থ, কলকাতার কোটিপতি মুসলমান ব্যবসায়ীরাও দুঃস্থ। পশ্চিমবঙ্গের শত শত মুসলমান জোতদার এবং বড় আকারের জমির মালিকরাও দুঃস্থ। তাদের সকলকেই সংরক্ষণের আওতায় আনতে হবে। বর্তমান সংবিধান অনুসারে ধর্মের ভিত্তিতে একজন মুসলমানকেও যে সংরক্ষণ দেওয়া যায় না — এ কথা শুনতেই রাজি নন মোল্লা সাহেব সহ অনেক খোদার বান্দারাই। মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য নেতা-মন্ত্রীরা অনেকেই ব্যাপারটি জানেন। আর জানেন বলেই 'কৌশল' করে মুসলমানদের ও-বি-সি ক্যাটাগরিতে নিয়ে সংরক্ষণ দেবেন। ঘোষণা করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের আড়াই কোটি মুসলমানদের দু'কোটিকে ও-বি-সি ক্যাটাগরিতে নিয়ে এসে তাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এ ছাড়া এই রাজ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য বার্ষিক বরাদ্দ এক লাফে আড়াই গুণ করে দেওয়া হয়েছে ২২. ৩. ২০১০ তারিখে ঘোষিত বাজেটে। ১২১ কোটি থেকে ৩০০ কোটি। এই দু'টো পদক্ষেপকেই আমরা ধ্বংসাত্মক বলে মনে করি। তাই তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এর কারণ হিসেবে ইতিহাস এবং মুসলিম ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী তথা ভারতে বসবাসকারী সব ধর্মের মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ১৮৮৫ খৃঃ জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। কিন্তু ভারতের মুসলমানদের বড় একটি অংশ এই তত্ত্ব মানতে পারেননি।

তাই ২০ বছর যেতে না যেতেই কেবলমাত্র মুসলমানদের সর্ববিধ উন্নতি ও অধিকার সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯০৬-এ জন্ম হয় মুসলিম লীগের। যে কোন বিচারে এটি একটি নিপাট সাম্প্রদায়িক দল। বলা প্রয়োজন, এই সাম্প্রদায়িক দলটির আসল জন্মদাতা বিশ্বের অন্যতম সেরা কূটকৌশলী বেনিয়া ইংরেজ। এরাই নগদ ১৪ লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিয়ে মুসলিম লীগ তৈরী করেছেন। (অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতির 'ভারত ইতিহাস পরিক্রমা, ১৯৯৮, পৃ-২০২, দ্বিতীয় অংশ)

তিন বছরের শিশু মুসলিম লীগ ১৯০৯-এ ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে মুসলমানদের জন্য আলাদা নির্বাচনী ব্যবস্থা আদায় করে নিতে পেরেছিল। সেই মুহূর্তে ভারত ভাঙার বীজটিও রোপন করেছিল তারা। ১৯১৬-এ কংগ্রেস লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষর করে সেই বীজটির অঙ্কুরোদগমে সহায়তা করেছিল। তারপর কংগ্রেস নেতৃত্ব 'ধর্মনিরপেক্ষতা এবং উদারতার' দোহাই দিয়ে শুরু করেন সীমাহীন মুসলিম তোষণ, যার পরিণতি ১৯৪৭-এর ভারত-বিভাজন। এর চেয়েও ধ্বংসাত্মক কাজ হচ্ছে আজকের 'ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানদের সংরক্ষণ'। এর সূত্রপাত যে-ই করুক না কেন, এর 'বি-শ্রীবৃদ্ধি' কল্পে সরাসরি আসরে নেমেছেন কমরেড-জনাব বুদ্ধদেব -অশোকবাবুরা। ভারতে তথা পৃথিবীর কোথাও ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের বিধান নেই। তাই বুদ্ধবাবু বললেন, 'না, আমরা ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দিচ্ছি না; আমরা মুসলমান সমাজের ক্রিমিলেয়ারকে বাদ দিয়ে গরীব-গুর্বো এবং পিছিয়ে পড়া সাধারণ মুসলমানদের সংরক্ষণ দিচ্ছি।' কারা পিছিয়ে পড়া গরীব সাধারণ মুসলমান ? যাদের মাসিক আয় ৩৭,৫০০ টাকা পর্যন্ত। এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম সাহেব বললেন, 'মুসলমান সমাজে পিছিয়ে পড়া বা অনগ্রসর বলতে কেউ নেই। তাই সমগ্র মুসলমানদের জন্যই সংরক্ষণ চাই।' মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লার সর্বাধুনিক মার্কসবাদী ফতোয়ার কথা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'কোন বাছ-বিচার নয়, সব মুসলমানের জন্য সংরক্ষণ চাই।' এটা না হলে নাকি মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে না।

কংগ্রেসের বয়স যখন ৩০ বছর তখন শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী রাজনীতি শুরু করেন (১৯১৫)। ইসলাম ধর্ম এবং হিন্দুদের গীতা সম্পর্কে তখনও কিছু জানতেন না নিরামিষভোজী এই বৈষ্ণব তনয়। অনেক পরে তিনি গীতা পড়েছিলেন। গীতা পড়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে 'রূপক যুদ্ধ' বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তিনি কখনও কোরান পড়েছেন এমন কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। তবে 'মহম্মদের বাণী সংকলন' (Sayings of Muhammad) পড়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

গান্ধীজী মাত্র ৪ বছর রাজনীতি করে ১৯১৯-এ ঘোষণা করলেন, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য গড়ে তিনি ৬-মাসের মধ্যে, মতান্তরে ১ বছরের মধ্যে ভারতের জন্য 'স্বরাজ' এনে দেবেন। এখান থেকেই শুরু হয় কংগ্রেস তথা গান্ধীজীর পরাজয় যাত্রা, যার প্রথম ধাপ শেষ হয় ১৯৪৭-এ ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাজনের মাধ্যমে।

সেদিন কংগ্রেসের অপর নাম ছিল গান্ধীজী এবং গান্ধীজীর অপর নাম ছিল কংগ্রেস। আমাদের দৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এই গান্ধীজীই একমাত্র ব্যক্তি যিনি 'অহিংস রাজনীতি' নামক একটি সোনার পাথর বাটির আবিষ্কারক। যে গীতা থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাদ দিলে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, সেই গীতার মধ্যে তিনি 'অহিংসা' ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাননি। যে কোরানের মধ্যে পৃথিবীর কোন মুসলমান অহিংসার ছিঁটে-ফোঁটাও খুঁজে পাননি, গান্ধীজী সেই কোরানের মধ্যে টন টন অহিংসা খুঁজে পেয়েছেন। যে কোরান গণতন্ত্র ও বিশ্বজনীন মানবাধিকার স্বীকার করে না ; যে কোরানের ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে নবী ও খোদার প্রতি সীমাহীন আনুগত্য এবং সামরিক শৃঙ্খলা দিয়ে (হাদীস আল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ-xxxi), গান্ধীজী সেই কোরানের মধ্যেও খুঁজে পেয়েছেন অখণ্ড মানবতাবাদ। আজকের বুদ্ধবাবু-অশোকবাবুরা কোরানের মধ্যে 'আসলী মার্কসবাদ' খুঁজে পেয়েছেন। তাদের কাছে ইসলাম ধর্ম আজ 'অহিফেন নহে, প্রায় অমৃত'। এনারা যেন প্রাচীন ভারতের কবি কালিদাসের যোগ্য বংশধর। যে ডালে বসে আছেন সেই ডালটাই কাটতে যাচ্ছেন।

সেদিনের কংগ্রেস ও গান্ধীজীর হিমালয়সম ভুলকে তারা আজও ভুল বলে স্বীকার করছেন না। তাঁরা আজও মানতে রাজী নন যে, সামান্য-সাধারণ ব্যতিক্রম ছাড়া কোরান-হাদীস মেনে চলা কোন মুসলমানই জাতীয়তাবাদী হতে পারে না। অনুরূপ ভাবে কোরান-হাদীস মেনে চলা কোন মুসলমানই যে কমিউনিস্ট হতে পারে না, আর কোরান-হাদীস না মেনে কেউ মুসলমান হতে পারে না, এই বোধটুকু আজও জন্মালো না কোন হিন্দু কমিউনিস্টের মনে। তাইতো কমিউনিজমের আলখাল্লা পরে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমান বিরাট সংখ্যক হিন্দু কমিউনিস্টকে হিন্দুবিরোধী করে দিতে পারলো।

ইতিহাস বলছে, ১৯৩৪-এ মি. মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ স্বেচ্ছানির্বাসনের জীবন শেষ করে লণ্ডন থেকে ফিরে এসে কোরান-হাদীস পড়ে কার্যত 'প্রথম শ্রেণির টুপিধারী মোল্লায়' রূপান্তরিত হয়ে ইসলাম ভিত্তিক রাজনীতি শুরু করেন এবং মাত্র ১২ বছরের মধ্যে কোরানে বর্ণিত দ্বিজাতি তত্ত্বের সফল ব্যাখ্যা করে ভারতের সিংহভাগ মুসলমানকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, হিন্দু এবং মুসলমান দু'টো আলাদা জাতি। এরা একই সঙ্গে একই দেশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে না। এর ফলেই ১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা গো-হারা হেরেছিলেন। বাংলায় অখণ্ড ভারতের সমর্থক সব জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

সেদিন ১০/১২ জন হিন্দু ছাড়া অন্য কোন হিন্দু বুদ্ধিজীবী বা মসিজীবী দ্বিজাতি তত্ত্বের মতো চরম সত্যকে স্বীকার করেননি। যারা স্বীকার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হলেন ভারতরত্ন ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর। তিনি তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ

করে রেখে গেছেন। তিনি কোরান-হাদীস সহ পৃথিবীর সব ধর্মশাস্ত্র এবং বিশেষভাবে ইসলামের ইতিহাস পড়েছিলেন বলেই এ কাজ করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত সঠিক-ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মি. জিন্নাহ্ এবং অন্যান্য প্রথম শ্রেণির মুসলমানরা হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব সম্পর্কে যা যা বলছেন তার সবটাই সত্য।

১৯৪০-এ মুসলিম লীগ যখন 'পাকিস্তান' শব্দটি ব্যবহার না করে 'লাহোর প্রস্তাব' পাশ করে তখন ড. আম্বেদকর ঐ প্রস্তাবের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে 'পাকিস্তান অর দি পার্টিশন অব ইণ্ডিয়া' নামে কালজয়ী গ্রন্থটি রচনা করেন। ১৯৪৬ পর্যন্ত এই গ্রন্থটির ৩-টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিছুদিন আগে মহারাষ্ট্র সরকার ইংরেজীতে আম্বেদকর রচনাবলী প্রকাশ করেন। এর ৮-ম খণ্ডে ঐ গ্রন্থটির ৩ য় সংস্করণ স্থান পেয়েছে। আমরা এই ৮-ম খণ্ড থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ করব।

বিশাল এই গ্রন্থটিতে ভারত ভেঙে পাকিস্তান বানাবার বিপক্ষে এবং পক্ষে অজস্র ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরেছেন এবং নিজেও মন্তব্য রেখেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টির বিপক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেছেন —

১) সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারত একটি ভৌগোলিক একক। তার একক চরিত্র প্রকৃতির মতই প্রাচীন। এর *(ভারতের)* মুসলিম অধ্যুষিত বেশ কিছু অংশ সহজেই বাকি অংশ থেকে আলাদা হতে পারে — এই যুক্তিতেই কি পাকিস্তান হতেই হবে? (অধ্যায়-১৩, পৃ-৩৪৭-৪৮)

২) কিছু সংখ্যক মুসলমান অখুশি বলেই কি ভারতের ঐক্য ধ্বংস করতে হবে? (অধ্যায়- ১৩, পৃ-৩৪৮)

৩) ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বাদ-বিসম্বাদ আছে বলেই কি পাকিস্তান বানাতে হবে? (অধ্যায়- ১৩ , পৃ-৩৪৮)

৪) মুসলমানরা একটি জাতি — এই কারণের জন্যই কি পাকিস্তান হতে হবে? ....... (কিন্তু) আইনের দৃষ্টিতে মুসলমানরা এখনও একটি জাতি হিসেবে গড়ে ওঠেনি। ('in the *de jure* or *de facto* sense of the term') (অধ্যায়- ১৩ , পৃ-৩৫২ এবং ৩৫৪)

৫) কংগ্রেসের উপর বিশ্বাস হারানোর জন্যই কি পাকিস্তান বানাতে হবে? (অধ্যায়-১৩, পৃ-৩৫২)

৬) স্বরাজ হবে হিন্দুরাজ — এই যুক্তিতেই কি পাকিস্তান বানাতে হবে? ..... হিন্দুরাজকে আটকাতে হবে। কিন্তু পাকিস্তান বানিয়ে তা কি সম্ভব হবে? (অধ্যায়-১৩ , পৃ-৩৫৫)

বাবাসাহেব অখণ্ড ভারতের পক্ষে উপরোক্ত কঠিন কঠিন যুক্তি দিয়েও মূলত দু'টি কারণে ভারত বিভাজনকেই সমর্থন করেছিলেন। কারণ দু'টি হচ্ছে — মুসলিম মানসিকতা

এবং ভারতের প্রতিরক্ষার নিশ্চয়তা।

আসুন, প্রথমে আমরা মুসলিম মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরি। এখানে বলা প্রয়োজন সেদিন প্রায় সব রাজনীতিবিদই 'আম্বেদকরের চোখে দেখা মুসলিম মানসিকতা' সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন। ঐ সব নেতারা ভুলেও কোরান-হাদীস পড়েননি। আজ সন্দেহ জাগে তারা ইসলামের ইতিহাসও পড়েছিলেন কিনা। আসুন, দেখি ড. আম্বেদকর মুসলিম মানসিকতা সম্পর্কে ঠিক কী বলেছেন —

১। সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের যত প্রকার বন্ধন আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সুদৃঢ় হচ্ছে মুসলিম ধর্মীয় বন্ধন।[১] (অধ্যায়-৩, পৃ-২১৬)

২। ইসলামে এক প্রকার ভ্রাতৃত্ববোধ আছে। কিন্তু এই ভ্রাতৃত্ববোধ মানুষে মানুষে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ নয়। এই ভ্রাতৃত্ববোধ কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে যারা আছেন তাদের জন্য আছে ঘৃণা এবং শত্রুতা।[২] (অধ্যায়-১২, পৃ-৩৩০)

৩। ধর্মীয় ক্ষেত্রে হিন্দুরা রামায়ণ, মহাভারত এবং গীতা থেকে প্রেরণা লাভ করেন। পক্ষান্তরে মুসলমানরা প্রেরণা লাভ করেন কোরান এবং হাদীস থেকে। তাই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের যে সব উপাদান আছে, তার চেয়ে বেশি উপাদান আছে বিভেদের।[৩] (অধ্যায়-২, পৃ-৩৬)

৪। হিন্দু ধর্মতত্ত্ব ও মুসলিম ধর্মতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে বাবাসাহেব বলেছিলেন, 'এমন কোন কিছুই নেই যা' এই দু'টি সম্প্রদায়কে এক জায়গায় নিয়ে আসতে পারে।' ['nothing to bring them in one bosom.' (অধ্যায়- ৭ , পৃ-১৯৩) গান্ধীজী কিংবা কংগ্রেসের প্রথম সারির কোন নেতা কিংবা তপসিলী সমাজের নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বা অন্য কেউ বাবাসাহেবের এই অভ্রান্ত মূল্যায়নকে তিলমাত্র মূল্য দেননি।

৫। এ কথা মানতে হবে যে, হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করা হয়েছে এবং তা সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।[৪] (অধ্যায়-১২, পৃ-৩০৫)

৬। মুসলমানদের ধর্মীয় বিধি বিধান এবং তাদের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে বাবাসাহেব বলেছেন 'দলবদ্ধ গুণ্ডামীই মুসলিম রাজনীতির বৈশিষ্ট্য।'[৫] (অধ্যায়-১১, পৃ-২৬৯) কিন্তু প্রায় কোন হিন্দুই ঐ দলবদ্ধ গুণ্ডামীর খোঁজ পাননি।

৭। মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে একটি মারাত্মক সত্য হচ্ছে 'দার-উল-ইসলাম (মুসলমানদের আবাসভূমি) ও দার-উল-হার্ব (ইসলামের শত্রুদের দেশ) তত্ত্ব '। বাবাসাহেব বলেছেন — এই তত্ত্ব অনুসারে ভারত হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মিলিত মাতৃভূমি হতে পারে না।[৬] (অধ্যায়-১২, পৃ-২৯৪)

৮। বিগত ৩০ বছরের (১৯১০-১৯৪০) ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বাস্তবায়িত হয়নি।[৭] (অধ্যায়-১২, পৃ-৩১৩)

৯। মুসলমানের দৃষ্টিতে যে কোন হিন্দু 'কাফের'। কাফের কখনও সম্মানের যোগ্য

নয়। সে হীনজন্মা এবং তার কোন মর্যাদা নেই। এই জন্য কাফের শাসিত দেশ শত্রুর দেশ। এরপর আর কোন প্রমাণের দরকার নেই যে, মুসলমানরা হিন্দুর নেতৃত্বাধীন কোন সরকারকে মানবে না।[৮] (অধ্যায়-১২, পৃ-৩০১)

একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে তার অখণ্ডতা অক্ষুন্ন রাখা। এর সঙ্গে কোন সমঝোতা নেই বা করা চলে না। এই অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য চাই একটি নিরাপদ সেনাবাহিনী। যে দেশে একাধিক ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করেন সে দেশের সেনাবাহিনীতে এমন কোন লোক নেওয়া চলে না যারা ধর্মান্ধ, যাদের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতার কোন মূল্য নেই। বাবাসাহেবের ভাষায় —

১। একটি নিরাপদ সেনাবাহিনী নিরাপদ সীমারেখার চেয়ে অনেক ভাল।[৯] (অধ্যায় ৫, পৃ- ১০১)

২। ভারতের সৈন্যবাহিনী হবে অবশ্যই হিন্দু-মুসলমানদের নিয়ে গঠিত এক মিশ্র সৈন্য-বাহিনী। ভারত যদি বিদেশী কোন শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন এই বাহিনীর মুসলমান সৈন্যরা ভারতের প্রতিরক্ষায় বিশ্বস্ত থাকবে এমন আস্থা রাখা যায় কি? মনে করুন আক্রমণকারীরা তাদের স্বধর্মাবলম্বী *(অর্থাৎ মুসলমান)*, সেক্ষেত্রে মুসলমান সৈনিকেরা ঐ আক্রমণকারীদের পক্ষে থাকবে না বিপক্ষে দাঁড়িয়ে ভারতকে রক্ষা করবে?[১০] (অধ্যায়-১৩, পৃ-৩৬৪)

৩। দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষ যদি মুসলমান সৈনিকদের দেহে সংক্রমিত হয়, তাহলে ভারতীয় সৈন্য নিরাপদ থাকতে পারবে না। এই (আক্রান্ত) সেনাবাহিনী ভারতের স্বাধীনতার রক্ষক না হয়ে স্বাধীনতার বিপক্ষে একটি অভিশাপ ও পরাক্রমশালী বিপদ হিসেবে কাজ করতে থাকবে।[১১] (অধ্যায়-১৩, পৃ- ৩৬৪)

৪। সঠিকভাবেই হোক আর ভুলক্রমেই হোক, বিরাট সংখ্যক মানুষ মনে করেন যে, পাকিস্তান দুষ্টবুদ্ধিতে ভরপুর। তাদের মতে পাকিস্তান সৃষ্টির উদ্দেশ্য দু'টি — একটি প্রাথমিক এবং অপরটি খানিকটা দূরবর্তী। প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি মুসলিম যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা। এবং পরবর্তী উদ্দেশ্য হচ্ছে হিন্দুস্থানকে (ভারতকে) আক্রমণ করে হিন্দুদের জয় বা পুনর্জয় করা* এবং শেষ

---

*কোটি কোটি টাকা খরচ করে যে আফগানিস্তানকে বন্ধু হিসেবে ধরে রাখার চেষ্টা চলছে, সেই আফগানিস্তানের কর্ণধার হামিদ কারজাই বলছেন, ভারত বন্ধু, আর পাকিস্তান তার যমজ ভাই। কবি গোলাম মোস্তফার দৃষ্টিতে কমিউনিষ্ট এবং মুসলমানরা জন্মগত ভাই। বাংলাদেশের রম্য রচনার যাদুকর আক্কেল আলি বলেছেন, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ফুল যেমন রূপান্তরিত কাণ্ড (Modified Shoot), কমিউনিজমও তেমনি রূপান্তরিত ইসলাম (Modified Islam)। ইসলামের জন্মগত ভাই (বা রূপান্তরিত ইসলাম) 'চীন' সবুজ সংকেত দিলেই আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান মিলে ভারত আক্রমণ করবে। অনেক রাজনীতি সচেতন অনেক চিন্তাবিদই এই বিপদের কথা ভাবতে শুরু করেছেন।

পর্যন্ত ভারতকে মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করা।[১২] (অধ্যায়-১৪, পৃ- ৩৭৬)

৬। তারা *(হিন্দু-মুসলমান)* অবশ্যই আলাদা হয়ে থাকবে। এমন কিছুই নেই, যা তাদের একত্রিত করতে পারবে।[১৩] (অধ্যায়-৭, পৃ-১৯৩)

৭। মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্রে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ বলে একটি নির্দেশ আছে। এই নির্দেশ অনুসারে মুসলিম শাসকদের সব দেশগুলোকেই মুসলিম শাসনের অধীনে নিয়ে আসার অধিকার দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না পৃথিবীর সব দেশ ইসলামের শাসনাধীনে আসে। পৃথিবী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে — দারুল ইসলাম (ইসলামের/শান্তির ভূমি) এবং দারুল হার্ব (যুদ্ধভূমি)। কৌশলগত ভাবে যে মুসলিম শাসকের সামর্থ্য আছে, তার কর্তব্য হচ্ছে দারুল হার্বকে দারুল ইসলামে পরিণত করা।[১৪] (অধ্যায়-১২, পৃ-২৯৫)

আজ যারা ভাষার মার-প্যাঁচে কার্যত ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানদের সংরক্ষণ দেবার জন্য আদা-জল খেয়ে আসরে নেমেছেন তাদের কাছে প্রশ্ন — ড. আম্বেদকর মুসলমানদের মানসিকতা সম্পর্কে যা যা বলে গেছেন তার একটি শব্দ বা একটি বর্ণও কি মিথ্যা? হিন্দুদের 'ভাই' বলে মনে করা তো দূরের কথা, মুসলমানরা কি পুতুলপুজারীদের মানুষ বলে মনে করেন? তারা আজও কি হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহকে আদৌ কোন ধর্মগ্রন্থ বলে মনে করেন? কোন মতবাদ কি আজও এমন কোন মন্ত্র আবিষ্কার করতে পেরেছে, যার দ্বারা হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় নিয়ে আসা সম্ভব হতে পারে? মুসলমানরা কি দারুল হার্ব ও দারুল ইসলাম তত্ত্ব কোনদিন পরিত্যাগ করতে পারবেন?

তা ছাড়া বাবাসাহেব ভারতের প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত যে সব অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, আজ কি তা অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে?

এখানে ইতিহাস থেকে ৩-টি ঘটনা উল্লেখ করছি। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল সিন্ধুতে, ৭১২ খৃস্টাব্দে। রাজা দাহিরের সিন্ধু আক্রমণ করেন মহম্মদ বিন কাশিম। দাহিরের সেনাবাহিনীতে অনেক মুসলমান সেনা ছিল। যুদ্ধ শুরু হলে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে কাশিমের বাহিনীতে যোগ দেয়। এবং অতি সহজে দাহিরকে পরাজিত করে তার মাথাটি কেটে সোনার থালায় বসিয়ে ইরাকের তৎকালীন শাসনকর্তা হাজ্জাজের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে কাশ্মীরে ১৯৪৭-এর অক্টোবর মাসে। তখন কাশ্মীর ছিল ভারত এলাকার মধ্যে একটি আলাদা স্বাধীন রাজ্য। ওখানকার রাজা ছিলেন মহারাজ হরি সিং। ১৯৪৭-এ তাঁর প্রধান সেনাপতি ছিলেন ব্রিগেডিয়ার রাজিন্দর সিং। ভারত বিভাজনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মহারাজকে বলেছিলেন— ইচ্ছে করলে আপনি স্বাধীন থাকতে পারেন। তবে আপনার উচিত হবে ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগদান করা। মহারাজ কিন্তু মনস্থির করতে পারছিলেন না। তিনি ছিলেন হিন্দু। কিন্তু তাঁর প্রজাদের অধিকাংশই মুসলমান। এদের নিয়ে কোন দিকে যাবেন তিনি — ভারতে

না পাকিস্তানে? পাকিস্তানের স্রষ্টা মি. জিন্নাহ্ সকলের অজান্তে প্রধানমন্ত্রী মি. লিয়াকত আলী খানের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যুদ্ধ করে কাশ্মীর ছিনিয়ে নেবেন। তখন পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী ছিলেন মি. যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল। একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী হয়েও তিনি কাশ্মীর আক্রমণের বিন্দু বা বিসর্গ কিছুই জানতেন না। এই ঘটনা ঘটেছিল সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে। তবে পরিকল্পনাটা ছিল নিশ্চিতভাবে অনেক আগের। ১৯৪৭-এর ১৪ আগষ্ট পাকিস্তানের স্বর্ণ সিংহাসনে বসেই পরিকল্পনাটিকে বাস্তবায়িত করার সিদ্ধান্ত নেন জিন্নাহ্ সাহেব। ২৪ আগষ্ট তিনি তাঁর মিলিটারী সেক্রেটারী কর্নেল উইলিয়াম বিরণীকে বললেন, বিশ্রাম গ্রহণের জন্য তিনি কাশ্মীরে গিয়ে দু' সপ্তাহ থাকবেন। কর্নেল বিরণী যেন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মহারাজ হরি সিং-এর কাছে এই খবর পৌঁছালে তিনি বুঝে নিলেন অচিরেই পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করবে। তাই মহারাজ জানিয়ে দেন যে, জিন্নাহ সাহেবকে তিনি কাশ্মীরের মাটিতে পা রাখতে দেবেন না।

কাশ্মীরের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু হয় ২২ অক্টোবর (১৯৪৭)। তখনও কাশ্মীরের প্রধান সেনাপতি ছিলেন ব্রিগেডিয়ার রাজিন্দর সিং। মুজাফফ্রাবাদে মুসলমান ও ডোগরাদের নিয়ে গঠিত ব্যাটেলিয়নের কমাণ্ডার ছিলেন লেঃ কর্ণেল নারায়ণ সিং। এই ব্যাটেলিয়নে অর্ধেক সেনা ছিল ডোগরা হিন্দু এবং অর্ধেক মুসলমান। নারায়ণ সিং এদের নিয়ে হানাদার বাহিনীকে আক্রমণ করতে গেলে মুসলমান সৈনিকরা বিদ্রোহ করে এবং ব্যাটেলিয়ান প্রধানকে খুন করে। অথচ মাত্র কিছুদিন আগে মহারাজা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মুসলমান সেনাদের বিশ্বাস করা যায় কিনা। সিংজী বিন্দুমাত্র চিন্তা-ভাবনা না করেই বলেছিলেন, ডোগরা সেনাদের চেয়ে আমি মুসলমান সেনাদের বেশি বিশ্বাস করি। এরপর পুরোপুরি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মহারাজা ভারত সরকারের কাছে সাহায্য চেয়ে 'এস-ও-এস' পাঠান। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে মি. ভি. পি. মেনন মহারাজার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ভারতে যোগ দিতে রাজী করান এবং শ্রীনগর ছেড়ে জম্মুতে আশ্রয় নিতে পরামর্শ দিয়ে নতুন দিল্লীতে চলে আসেন পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করতে।

শ্রীনগর থেকে জম্মু দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে মহারাজার সময় লেগেছিল ১৭ ঘন্টা। শ্রান্ত-ক্লান্ত মহারাজা ঘুমাতে যাওয়ার আগে তাঁর এ-ডি-সিকে ডেকে বললেন, মি. মেনন যদি দিল্লী থেকে ফিরে আসেন তাহলে বোঝা যাবে যে, দিল্লী আমাদের সাহায্য করবে। সেক্ষেত্রেই কেবল আমাকে ঘুম থেকে জাগাবে। আর মি. মেনন ফিরে না এলে আমার এই রিভলভার দিয়ে আমাকে মেরে ফেলবে।

বেশ কিছু আনুষ্ঠানিকতা সেরে নিয়ে মাউন্টব্যাটেন রাজী হলেন এবং ভারতীয় সেনারা গিয়ে মহারাজাকে এবং কাশ্মীরকে বাঁচালেন। কাশ্মীর ভারতের অঙ্গ রাজ্য হল। কিন্তু বাঁচলেন না মহারাজার প্রধান সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার রাজিন্দর সিং এবং তাঁর প্রধান সহযোগীরা, যারা সংখ্যায় ছিলেন ১৫০ জন। তাঁরা নিহত হয়েছেন

ছদ্মবেশী পাকিস্তান বাহিনী এবং তাদের সহযোগী কাশ্মীরের মুসলমান সেনাদের হাতে যারা একটু আগেও ডোগরা সেনাবাহিনীর চেয়ে 'বিশ্বস্ত' ছিল। (বিস্তারিত জানতে দেখুন ঃ ভি.পি. মেননের 'দি স্টোরি অব ইন্টিগ্রেশন অব দি ইণ্ডিয়ান স্টেটস', ১৯৫৬, পৃ-৪১৫ এবং শঙ্কর ঘোষের 'হস্তান্তর', ১ম খণ্ড, ১৯৯৯, পৃ-৩৩)

শোনা যায়, রাজিন্দর সিংহকে গাছের ডালে বেঁধে গুলি করে করে সমস্ত দেহ ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছিল।

সেদিন আর একটি ঘটনা ঘটেছিল। ধর্মনিরপেক্ষতার জ্বলন্ত প্রতীক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বিশ্বাস ক'রে যে সকল মুসলমানকে তাঁর আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর উচ্চ পদে বসিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই সেদিন জিন্নাহ্ বাহিনীর হয়ে কাশ্মীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন কর্ণেল হাবিবুর রহমান, মহম্মদ জামান কিয়ানি এবং বুরহানুদ্দিন সহ আরও অনেকে। (পূর্বোক্ত গ্রন্থ) জানি না, সেদিনের পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী আজকের এখানকার দলিত-মুসলিম ঐক্য গড়ার পথ-প্রদর্শক বলে সম্মানিত যোগেনবাবু কবে এ কথা জানতে পেরেছিলেন।

তৃতীয় ঘটনাটি ঘটেছে ২০০১-এর অক্টোবর মাসে; বাংলাদেশে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব থেকে শুরু করে ২০০০ পর্যন্ত ভারত সরকার ওখানকার আওয়ামি লীগকেই সমর্থন করে আসছিল। এই সমর্থন শুধু নৈতিক সমর্থন নয়, এর বাইরেও অনেক কিছু। কিন্তু ২০০১-এর অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্বে মুজিব তনয়া শেখ হাসিনা আমাদের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর কাছে সাহায্য চেয়েও পেলেন না। কারণ, অটলজীর পরামর্শদাতাদের সামনে আগেই বেগম খালেদা টোপ দিয়ে রেখেছিলেন যে, তিনি ক্ষমতা পেলে ভারতকে অঢেল গ্যাস সরবরাহ করবেন। বৃদ্ধ অটলজী গ্যাস পাবার আশায় খালেদার মাথায় আশীর্বাদের বন্যা বইয়ে দিলেন। আমাদের জানা মতে সেদিন খালেদার টাকা-পয়সার মোটেই অভাব ছিল না; টাকার অভাব ছিল হাসিনার। কারণ, সেদিন আমেরিকা এবং সৌদি আরব হাসিনার বিরুদ্ধে ছিল। তাই খালেদা চেয়েছিলেন ভারত হাসিনাকে আর্থিক সাহায্য না দিক। এই জন্য তিনি গ্যাসের টোপ দিয়েছিলেন এবং অটলজী সেই টোপে পা দিয়ে হাসিনাকে বঞ্চিত করেছিলেন। হাসিনা হেরে গেলেন।

জিতে গেলেন খালেদা এবং নির্বাচনের ফলাফল সরকারী ভাবে প্রকাশিত হবার আগেই খালেদা অটলজীকে ভুলে গিয়ে তার রাজাকার বাহিনীকে লেলিয়ে দিলেন সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে, বিশেষ ভাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে। তৈরী হল হিন্দু নিধন ও হিন্দু নারী ধর্ষণের আর একটি কলঙ্কময় অধ্যায়। গ্যাস সরবরাহের ব্যাপারটি চাপা পড়ে গিয়েছিল বঙ্গোপসাগরের অতল তলে।

বাংলাদেশের মিডিয়া সেদিন ঐ কলঙ্কের কথা সোচ্চারে প্রকাশ করেছিল। কিন্তু ভারতের মিডিয়া প্রায় সবটাই চেপে গিয়েছিল। সম্প্রতি ২৮.৩.২০১০ তারিখে কলকাতার

মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে দৈনিক স্টেট্সম্যান পত্রিকার সাহসী সম্পাদক শ্রীমানস ঘোষ এ ব্যাপারে কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন এবং সেই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে শ্রীচিত্তরঞ্জন দে সম্পাদিত 'সংহতি সংবাদ' পত্রিকার এপ্রিল মাসের (২০১০) সংখ্যায়।

এ সব ঘটনা উল্লেখ করে আমরা বলতে চাই তোযণের মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান হতে পারে না। আজ ভারতের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার মুসলমানদের প্রত্যেককে একটি করে পাকা বাড়ি করে দিলেও তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হবে না, যেহেতু কোরান এবং হাদীস অপরিবর্তনীয়।

সুধী পাঠকমণ্ডলীকে স্মরণ করিয়ে দিই, বাবাসাহেব ড. আম্বেদকরের পূর্বোক্ত গ্রন্থটি (পাকিস্তান অর দি পার্টিশন অব ইণ্ডিয়া) প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪০-এর ৩১ ডিসেম্বর এবং কাশ্মীরের ঘটনাটি ঘটেছিল এর মাত্র ৭ বছর পরে ১৯৪৭-এর অক্টোবর মাসে। কাল বা পরশু যদি পাকিস্তান আমাদের আক্রমণ করে, সঙ্গে সঙ্গে চীন তার কমিউনিজম ভিত্তিক অসাম্প্রদায়িকতা সিন্দুকে তালাবদ্ধ করে রেখে কোরান-ভিত্তিক পাকিস্তানকে সাহায্য করবে, যেমন করেছিল ১৯৭১-এ। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলি তাদের টাকার বস্তা খুলে দেবে। তখন ভারতের মুসলিম সেনারা কী করবে?

এখানে পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, মুসলিম সংরক্ষণের সঙ্গে এর মিল কোথায়। এর উত্তরে বলছি, দায়িত্ব নিয়েই বলছি, আজ যদি ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানদের সংরক্ষণ দেওয়া হয় অল্প দিনের মধ্যেই তারা প্রতিরক্ষা বিভাগেও অনুরূপ সংরক্ষণের দাবি জানাবে। আর তখন অনেক মোলায়েম-মমতা-রেজ্জাক পার্লামেন্ট অচল করে দিয়ে বলবে, আভি দাও, জলদি দাও। হয়ত বা ইমাম সাহেবরা সরকারী-বেসরকারী মাদ্রাসা থেকে পাশ বা ফেল করা ছাত্রদের সেনাবাহিনীতে চাকুরী দেবার জন্য জেদ ধরবে। হয়ত বা কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম সাহেবের ভাষায় বলবে, সেনাবাহিনীতে মাদ্রাসার ছাত্রদের সংরক্ষণ না দিয়ে আমাদের উপর 'ইনজাস্টিস' করছেন আপনারা। এই 'ইনজাস্টিস' বন্ধ করুন। তা নাহলে আমরা জেহাদ করবো। জেহাদ আমাদের ধর্মীয় অঙ্গ। কেউ বাধা দিতে পারবেন না।

জেহাদ ব্যাপারটা কি তা এখানে অল্প কথায় বলে নিচ্ছি। 'জেহাদ' একটি আরবী শব্দ। জেহাদ কাকে বলে, কিভাবে জেহাদ করতে হবে সে সম্পর্কে অজস্র নিবন্ধ লেখা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত টমাস পেট্রিক হিউজ (Thomas Patrick Hughes) তাঁর 'ডিকশনারী অব ইসলাম'-এ (রূপা অ্যাণ্ড কোং, নতুন দিল্লী, ১৯৯৯, পৃ-২৪৩) একটি নিবন্ধ লিখেছেন। এটি প্রামাণ্য বলে পণ্ডিত মহলে স্বীকৃত হয়েছে। এই নিবন্ধে বলা হয়েছে, 'জেহাদ' বলতে বুঝায় 'একটি চেষ্টা অথবা কঠোর চেষ্টা।' ... 'মহম্মদের ধর্মমতে যারা বিশ্বাসী নয় তাদের

বিরুদ্ধে *(ইসলামী)* ধর্মযুদ্ধ। এটি কোরান নির্দেশিত অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্য।'

মুসলমানদের মধ্যে প্রায় সকলেই জেহাদকে* ইসলামের ৬ষ্ঠ স্তম্ভ বলে বর্ণনা থাকেন। এই জেহাদ সম্পর্কে কোরান ও হাদীসে অজস্র বিধান আছে। এখানে আমরা কয়েকটি মাত্র বিধান উল্লেখ করছি।

* "হে নবী! অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, তাদের প্রতি কঠোর হও; তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম।" (৯:৭৩)

*(অবিশ্বাসী বলতে সব অমুসলমানদের বুঝায়; হিন্দুরা তো বটেই। — লেখক)*

* " আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস কর এবং রসুলের সঙ্গী হয়ে সংগ্রাম কর, ..." (৯: ৮৬)

* "বিশ্বাসীগণ পরস্পর ভাইভাই, সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।" (৪৯:১০; মদনী সূরা)

* "তোমরা তাদের *(অবিশ্বাসীদের)* সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ধর্ম *(অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম)* প্রতিষ্ঠিত না হয়। ..." (২:১৯৩; ৮:৩৯; মদনী সূরা)

* "... আমি অচিরেই অবিশ্বাসীদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করছি। অতএব, তাদের কণ্ঠ সমূহের উপর আঘাত কর, এবং তাদের অঙ্গুলির সংযোগ সমূহে আঘাত কর। এটি এই জন্য যে, তারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করেছিল, ..." (৮: ১২-১৩) *(ভারতে হিন্দুদের মনে ভীতির সঞ্চার করা হয়েছে অনেক আগে থেকে। এই কারণেই মুসলিম তোষণ বেড়ে যাচ্ছে হু হু করে। —লেখক)*

* "... অংশীবাদীদের *(যারা মনে করেন সৃষ্টিকর্তার বিভিন্ন রূপ আছে)* যেখানে পাবে, বধ করবে; তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে, কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ উন্মুক্ত করে দেবে; ..." (৯: ৫)

---

****JIHAD : Lit.*** "An effort, or a striving." A religious war with those who are unbelievers in the mission of Muhammad.. It is an incumbent religious duty, established in the Qur'an and in the Traditions as a divine institution, and enjoined specially for the purpose of advancing Islam and of repelling evil from Muslims.When an infidel's country is conquered by a Muslim ruler, its inhabitants are offered three alternatives:—

(1) *The reception of Islam*, in which case the conquered become enfranchised citizens of the Muslim state.

(2) *The Payment of a poll-tax (Jizyah)*, by which unbelievers in Islam obtain protection, and become *Zimmis,* provided they are not the idolaters of Arabia.

(3) *Death by the sword*, to those who will not pay the poll tax.
[From page- 243 of T.P.Highe's Dictionary of Islam]

* "হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ *(মুসলমানরা)*! অংশীবাদীরা *(হিন্দু এবং অন্যান্য পুতুলপুজারীরা)* অপবিত্র ব্যতীত নয়। ...." (৯: ২৮)

* "যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে না, এবং আল্লাহ্ ও তার রসুল যা বৈধ করেছেন, তা বৈধ করে না, এবং যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা সত্য ধর্মকে স্বীকার করে না, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, যে পর্যন্ত তারা অধীনতা স্বীকার করে স্বহস্তে জিজিয়া (কর) দান না করে।" (৯:২৯)

* " সুতরাং তুমি অবিশ্বাসীদের আনুগত্য করোনা, এবং তুমি কোরানের সাহায্যে ওদের সাথে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও।" (২৫:৫২)

* "ওরাই অভিশপ্ত, এবং ওদের যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।" (৩৩:৬১; মদনী সূরা)

* "হে নবী! অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর, তাদের প্রতি কঠোর হও; তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম।" (৯:৭৩)

* "... যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভার আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের, ..." (৮: ১; মদনী সূরা)

* "... যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র ও রসুলের..." (৮: ৪১) " যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করেছ, তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর, ..." (৮:৬৯)

জেহাদের মাধ্যমে যখন কোন মুসলমান শাসক কর্তৃক অবিশ্বাসীদের রাজ্য জয় করা হয়, তখন ঐ রাজ্যের অধিবাসীদের নিকট নিম্নোক্ত তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণের আহ্বান জানানো হয় ঃ—

১। 'ইসলাম' গ্রহণ, যে ক্ষেত্রে ঐ বিজিত জাতি মুসলিম রাজ্যের স্বীকৃত নাগরিক হবে।

২। ব্যক্তি-কর (জিজিয়া) প্রদানের দ্বারা ইসলামে অবিশ্বাসীরা সুরক্ষা পাবে এবং যদি তারা আরবের পুতুল পূজারী না হয় তবে 'জিম্মী' বলে পরিগণিত হবে।

৩। যারা ব্যক্তি-কর (জিজিয়া) না দেবে তাদের তরবারির দ্বারা হত্যা করা হবে।"

'পাকিস্তান অর পার্টিশন অব ইণ্ডিয়া'-য় ড. আম্বেদকর জেহাদ সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়েছেন। দেখুন-দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ-২৯৫, ২৯৬। এর মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে, একজন মুসলমান শাসকের ধর্মীয় কর্তব্য হচ্ছে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ মুসলমানের অধীনে না আসা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। পৃথিবীর দেশগুলি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে — দারুল ইসলাম (ইসলামের/মুসলমানদের আবাসভূমি এবং দারুল হার্ব (যুদ্ধ ভূমি)। মুসলমান শাসকের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেকটি দারুল হার্বকে দারুল ইসলামে পরিণত করা।[১৪] (অধ্যায়- ১২, পৃ-২৯৫)

আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীমণ্ডলী, রাজ্যপাল, রাজ্য সরকার, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের প্রতিটি নেতা-কর্মী এবং প্রত্যেকটি বুদ্ধিজীবীদের কাছে

আমাদের প্রশ্ন — স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের মানসিকতার কি এতটুকু পরিবর্তন হয়েছে? পরিবর্তন হওয়া কি আদৌ সম্ভব?

বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় এমন কোন নোংরা শব্দ নেই যা বামপন্থীরা ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেননি। সেই বামপন্থীরা আজ ইসলাম ধর্মের মধ্যে 'প্রায় অমৃত' আবিষ্কার করে ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানদের সংরক্ষণ দিতে এগিয়ে এসেছেন। এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডান-পন্থীরা বাজেটে ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানদের ঢালাও সুযোগ সুবিধা দিলেন। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় হোর্ডিং দিয়ে বলা হয়েছে, ১৬ থেকে ৩২ বছর বয়সের সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার জন্য ঋণ দেওয়া হবে। শিক্ষা বলতে মাদ্রাসার শিক্ষাও বুঝায়। এবারের রেল বাজেটে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদেরও ট্রেন ভাড়া ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে।

এই নিবন্ধে মুসলিম ধর্মশাস্ত্র থেকে যে সব উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তা খুব পরিচ্ছন্ন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় প্রতিটি মাদ্রাসায়, তা সে মাদ্রাসা সরকার অনুমোদিত হোক বা না হোক। আপনারা নিশ্চিত ভাবে জেনে নিন, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশকে নরকে পরিণত করেছে যে মাদ্রাসা শিক্ষা, সেই মাদ্রাসা শিক্ষাই এখানে চলছে। কারণ, কোরান-হাদীসের বক্তব্যকে ছাত্র-ছাত্রীদের শেখানোই মাদ্রাসা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবু কয়েকটি মাদ্রাসায় দেশ-বিরোধী কাজকর্মের খবর পেয়েছিলেন। আবার খোঁজ নিয়ে দেখুন, সব মাদ্রাসারই শিক্ষার উদ্দেশ্য এক। তা নাহলে মোল্লা-মুসল্লী-ইমামরা এতদিনে মাদ্রাসাগুলিকে গুঁড়িয়ে দিতেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা পাকিস্তানকে কিভাবে নরকে পরিণত করেছে তার একটুখানি বিবরণ দিচ্ছি। ইসলামী দর্শন ও ইসলামী শিক্ষাকে ভিত্তি করে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয়েছিল। 'ইসলামবিরোধী লবির চক্রান্তে' ১৯৭১-এ একটি বিপর্যয় ঘটে যায়। জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশের। এই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার জন্য পাকিস্তান তাদের আন্তর্জাতিক দোসরদের নিয়ে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে সপরিবারে খুন করে। এরপর প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক পাকিস্তানে নতুন উদ্যমে মাদ্রাসার মাধ্যমে রাষ্ট্র ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের প্রয়োগ শুরু করেন। এর ফলে পাকিস্তানের যে দুর্দশা হয়েছিল তা প্রকাশ করেছেন জেনারেল পারভেজ মোশারফ হোসেন। ২০০২-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি তিনি করাচীতে অনুষ্ঠিত একটি কনফারেন্সে (Science and Technology Conference) বক্তৃতা* দিতে গিয়ে

---

* "To-day we are the poorest, the most illiterate, the most backward, the most unhealthy, the most unenlightened, the most deprived and the weakest of all human race." [From: 'Madrasa Education and the Condition of Indian Muslims', by D Bandyopadhyay EPW Commentary, April 20, 2002 ]

বললেন, পৃথিবীর মধ্যে আজ আমরা সবচেয়ে গরীব, সবচেয়ে নিরক্ষর, সবচেয়ে পশ্চাদপদ। আমরা বিশ্রীভাবে স্বাস্থ্যহীন, চরম কুসংস্কারযুক্ত, চরম বঞ্চনার শিকার। আমরা মনুষ্যজাতির মধ্যে সবচেয় দুর্বল হয়ে পড়েছি। তাই আজ আমাদের আত্মসমালোচনায় ব্রতী হতে হবে।

দারিদ্র্যের মাপকাঠীতে পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশ কতটা উপরে বা নীচে তা বলা কঠিন। তবে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত জঙ্গিদের উৎপাত যে বাংলাদেশেই বেশি তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনা এবং তাঁর সহকর্মীরা। ১৯৭১-এ নিরক্ষর রাজাকার বাদে যে সব দুর্বৃত্তরা গণহত্যায় অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে শতকরা ৯৯.৯৯ জন ছিল মাদ্রাসায় তালিম নেওয়া। ২০০১-এ বেগম খালেদা ক্ষমতায় এসে ৫ বছরের মধ্যে সেনাবাহিনীতে যত লোক নিয়েছে, তার মধ্যে শতকরা ৩৫ জন এসেছে ওখানকার কওমী মাদ্রাসা থেকে। (দেখুন-দৈনিক স্টেট্সম্যান, ১৮.৪.২০০৭, পৃ-৭) ওখানকার কওমী মাদ্রাসা এবং আমাদের এখানকার খারিজি মাদ্রাসা একই মুদ্রার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন মাদ্রাসার ছাত্ররা ভারতের প্রতিরক্ষা সহ সর্বত্র সংরক্ষণের জন্য জেহাদ ঘোষণা করবে।

সংখ্যালঘুদের উন্নতির দোহাই দিয়ে সরকার যা করা শুরু করেছে তা তৃতীয় শ্রেণির তোষণ ছাড়া কিছুই নয়। এই তোষণের পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে তা সকল হিন্দুকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করে মুসলমান বুদ্ধিজীবীরাও ভেবে দেখতে পারেন। স্মরণ করতে পারেন ড. আম্বেদকরের সাবধান বাণী। কংগ্রেস ১৯১৬-তে লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে শুরু করে একের পর এক তোষণমূলক কাজ করে ভারত বিভাজনের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল। ১৯৪০-এ ড. আম্বেদকর কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, সবাই জেনে নিন তোষণের কোন সীমারেখা নেই — 'Appeasement sets no limits ...." (Pakistan or .. p-270/Chapter-XI)

আপনারা বলুন, ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দেওয়া কি নির্লজ্জ মুসলিম তোষণ নয়? তোষণের অভিযোগ যাতে না আসে তার জন্য আপনারা সাচার কমিটি এবং রঙ্গনাথ মিশ্র কমিটিকে দিয়ে অনেক তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। সে সব 'অনেক বড় মাপের ব্যাপার'। জমিদারবাবুর গোয়ালের গরু আর হিসেবের গরুর সংখ্যা নিরুপণের মতো। অনেক সময়ই হিসেবে অনেক গরু থাকে, কিন্তু গোয়ালে থাকে না। আবার কোন কোন সময় গোয়ালে যত গরু থাকে হিসেবে তত থাকে না। আমরা সাধারণ চোখে যা দেখছি তা এ রূপ —

* পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের মুসলমানরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি তৃপ্ত। কার্যত তারা সবচেয়ে সুখে আছে। তারা যাতে আরও সুখে থাকতে পারে সে ব্যবস্থা

করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন আমাদের রাজনীতিবিদরা। অপরদিকে এই মুহূর্তে পৃথিবীর মধ্যে বিপন্নতম মানুষ হচ্ছে ৩ কোটির বেশি হিন্দু এবং আদিবাসী যারা ১৯৪৭-এর দেশ ভাগের ফলে চিরদিনের জন্মভূমি ত্যাগ করে প্রাণ বাঁচাবার জন্য ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের শতকরা ৯৫ জন মানবেতর জীবন যাপন করছেন। ভারতের দরিদ্রতম মুসলমানটিও এদের তুলনায় ১০০ গুণ ভাল আছে। ভারতে বনবাসী হিন্দুদের (আদিবাসী) বিরাট অংশ গরীব মুসলমানের তুলনায় ১০০ গুণ দুরবস্থার মধ্যে আছেন। মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা জানাবেন কি, কিসের ভিত্তিতে আপনি পশ্চিমবঙ্গের সব মুসলমানকে দুস্থ বলে দাবি করছেন? দারিদ্র্য বা সাম্প্রদায়িকতার কারণে একজন মুসলমানও কি ভারত ত্যাগ করছে?

কেন আমরা ভারতের মুসলমানদের সবচেয়ে সুখী বলছি, প্রথমে তার কারণ দেখাচ্ছি —

মুসলিম লীগ প্রচারিত দ্বিজাতি তত্ত্ব অনুসারে বর্তমান ভারতের ৩০ থেকে ৩৫ কোটি মুসলমানদের এখন পাকিস্তানের মতো 'একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে' বসবাস করার কথা। পারভেজ মোশারফের ভাষায় 'যে রাষ্ট্র আজ পৃথিবীর মধ্যে দরিদ্রতম এবং কু-সংস্কারাচ্ছন্ন', সেই রাষ্ট্রে বসবাস করার কথা। কিন্তু সেখানে তাদের যেতে হয়নি। ভারত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র দেশ যেখানে মুসলমানরা তাদের ধর্মশাস্ত্র থেকে পছন্দ মতো বিধান পালন করে আনন্দে দিন কাটাতে পারেন। এখানে সিভিল ব্যাপারে 'মুসলিম আইন' মেনে চলার বিধান এবং সুযোগ আছে, কিন্তু ক্রিমিনাল ব্যাপারে শরিয়তি বিধান মেনে চলার বিধান নেই। এখানে চুরি করলে বা অবৈধ যৌনসহবাস করলে হাত কাটা যাবে না বা অপরাধীকে পাথর ছুঁড়ে মারা হবে না।

* এখানে রাষ্ট্রপতির মতো সর্বোচ্চ পদ থেকে সর্ব নিম্ন পদে অধিষ্ঠিত হবার আইন এবং সুযোগ আছে। উদাহরণও আছে। এখানে যোগ্যতার মাপকাঠিতে আশরাফ-আতরাফ-আরজাল নির্বিশেষে একজন মুসলমান মহিলা বা পুরুষ যে কোন চাকুরী সহ উচ্চ পদে নিয়োগ পেতে পারেন।

* ভারতের বিচার বিভাগে একজন মুসলমান বিচারক যে সুযোগ পেতে পারেন পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্রে তা পেতে পারেন না। ধরুন একজন পুরুষ মুসলমান জিলা ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারকের অন্য কোন পদ পেলেন। তিনি চাইলে রাতের বেলা একই সময় ৪-জন বিবাহিতা স্ত্রী এবং তার সঙ্গে যত সংখ্যক খুশী দাসীর সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। ভারতের কোন হিন্দু বা মুসলমান এই কাজে বাধা দিতে পারবেন না। তিনিই আবার দিনের বেলা আদালতে এসে একটির বেশি বিয়ে করলে একজন হিন্দুকে শাস্তি দিতে পারবেন। ঐ বিচারকই আবার তাঁর অপছন্দের স্ত্রীকে তিন বার তালাক শব্দ উচ্চারণ করে ঘর থেকে বের করে দিতে পারবেন এবং সারা জীবনই এ কাজ করে যেতে পারবেন। মিশর, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ সহ অনেক মুসলিম

দেশেও এমন সুযোগ নেই।

এই ভারত এমন একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ যেখানে বিশেষ বিবাহ আইনের (Special Marriage Act) সুযোগ নিয়ে একজন মুসলমান অন্য যে কোন ধর্মের মেয়েকে ধর্মান্তরিত না করেই বিয়ে করতে পারবে। তারপর সময় ও সুযোগ মতো তাকে মুসলমান বানাতে পারবে। পরবর্তী যে কোন সময় তাকে তালাক শব্দ উচ্চারণ করে তাড়িয়ে দিয়ে আর একজন মহিলাকে বিয়ে করতে পারবে। পৃথিবীর কোন দেশেই এই ধরনের বিশেষ বিবাহ আইন নেই। অন্যান্য দেশে মুসলমানরা বিধর্মী মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে ঠিকই; তবে বিয়ের আগে ঐ মেয়েটিকে মুসলমান বানাতে হবে।

এই ভারত এমন একটি দেশ যেখানে একজন হিন্দু ছেলে উপরোক্ত বিশেষ আইন বলে একজন বিধর্মী মেয়েকে ধর্মান্তরিত না করেও বিয়ে করতে পারবে; কিন্তু মেয়ের আত্মীয়-স্বজনেরা যদি ঐ ছেলেটিকে খুন করে, খুন করার হুমকি দেয় তাহলে আইন তাকে রক্ষা করতে যাবে না। দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি —

১। শৈলেন্দ্র প্রসাদ নামে একটি হিন্দু ছেলে মুর্শিদাবাদের মানেরা খাতুনকে রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে করেছিল মুম্বাইতে। তাদের একটি পুত্র সন্তানও জন্মে। ২০০৮-এর ১ জুলাই শৈলেন্দ্র মুসলমান নাম নিয়ে মুর্শিদাবাদে বেড়াতে আসে। কিন্তু তার শ্বশুরের সন্দেহ হয়। সে গ্রাম্য মাতব্বরদের ডেকে এই সন্দেহের কথা বলে। তখন গ্রাম্য বিচার সভা বসিয়ে শৈলেন্দ্রকে মৃত্যু দণ্ড দেয়। এই দণ্ড কার্যকরী করে গজু শেখ, সাত্তার শেখ, খায়রুল শেখ এবং আরও অনেকে। শৈলেন্দ্রকে পাট ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে জবাই করা করা হয়। ১৭.৭.২০০৮ তারিখে তার মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার করা হয়।

২। বারাসাতের (কলকাতা-১২৪) অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় ভালবেসে বিয়ে করেছিল বাদুরিয়ার (উ. ২৪ পরগনা) স্কুল শিক্ষক নজরুল ইসলামের মেয়ে রেহানাকে। দু'জনেই প্রাপ্তবয়স্ক। যথা সময়ে তাদেরও একটি পুত্র সন্তান হয়। তারপর রেহানাকে তার বাপের বাড়ির লোকেরা নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে। অর্ক ৩১.৭.২০০৮ তারিখে তার ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে আসার জন্য বাদুরিয়ায় যায়। তখন ওর শ্যালক মনিরুল ইসলাম অর্কের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। অর্ক মরতে মরতে কোন রকমে বেঁচে যায়। খরচ হয়েছে কয়েক হাজার টাকা।

৩। নদীয়ার শান্তিপুরের সূত্রাগড় অঞ্চলের চঞ্চল সাধুখাঁ ভালবেসে বিয়ে করেছিল লিয়াকত আলি সেখের কন্যাকে। কয়েকদিন পরে তারা চঞ্চলদের বাড়ি আক্রমণ করে। কিন্তু চঞ্চল বা তার স্ত্রীকে না পেয়ে পিস্তল দিয়ে গুলি করে চঞ্চলের বাবাকে খুন করে। (এই ৩-টি তথ্যের বিস্তৃত বিবরণ পাবেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্তের লেখা 'নিঃশব্দ সন্ত্রাসে'। যোগাযোগ - ৯৪৩৩০ ৪৭১৪৪)

এই ভারত এমন একটি দেশ যেখানে মুসলমান শ্বশুর তার পুত্রবধূর সঙ্গে যৌন সহবাস করার সুযোগ আদায় করে নিচ্ছে। কার্যত অধিকাংশ মোল্লা-মৌলভীরাই শরিয়ত থেকে বিধান খুঁজে বের করে ঐ অধিকার আদায় করে দিচ্ছে। আর আমাদের আইন এবং আইন প্রয়োগকারী মেসিনারী 'নিদ্রামগ্ন ভগবান' সেজে 'গোলযোগ সইতে পারেন না' বলে ঘুমুতে থাকেন। তা না করলে ইমাম সাহেবরা বলবেন, আপনারা আমাদের মোছলমানদের উপর 'ইনজাস্টিস' করছেন। এই ইনজাস্টিস বন্ধ করুন, তা নাহলে আমরা জেহাদ করবো। জেহাদ আমাদের ধর্মীয় অঙ্গ। সুফী মতবাদে বিশ্বাসী কোন কোন বুদ্ধিজীবী বলছেন, জেহাদে অস্ত্রধারণের কথা নেই। মনের কু-প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধের নাম জেহাদ। সেকুলার হিন্দু বুদ্ধিজীবীরাও অনেকে এই মতবাদে বিশ্বাসী। আসলে এই উপমহাদেশের সিয়া বা সুন্নী মুসলমানরা কেউ সুফীদের মুসলমান বলেই মনে করেন না। সেক্ষেত্রে জেহাদ সম্পর্কে তারা কি বলল না বলল তাতে কিছু আসে যায় না। সিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে জেহাদের সহজ অর্থ অমুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করা।

এই ভারত সেই বাক-স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার ভূ-স্বর্গ যেখানে খোদা বা আল্লাহ্, ইসলাম বা নবীর বিন্দুমাত্র সমালোচনা করা চলবে না। কিন্তু দেবী সরস্বতীর নগ্ন মূর্তি আঁকা চলবে। এই সেই ভারত যেখানে মোল্লা এবং ইমামরা ইসলামের সমালোককে খুন করার জন্য প্রকাশ্যে পুরস্কার ঘোষণা করতে পারে এবং পুলিশ প্রশাসন তাদের দফতরে নিয়ে চা-মিষ্টি খাওয়ায়। এরপর পুলিশ কর্তা ঘোষণা করেন যে, মৌখিক ভাবে খুনের হুমকি কোন অপরাধ নয়।

এই সেই ভারত যেখানে ২৬/১১-এর মুম্বাই হামলার জীবিত জঙ্গী কাসভ অক্লেশে বলতে পারে 'আমি জঙ্গী নই। আমি ভারতে বেড়াতে এসেছিলাম মাত্র।'

এই সেই ভারত যেখানে মাত্র কয়েকদিন আগে আলোচনার অছিলায় পাক প্রতিনিধি এসে আলতো ভাবে আমাদের দু'কান মলে দিয়ে বলে গেল, মুম্বাই হামলা সম্পর্কে ভারত সরকার যা বলছেন তা নিছক সাহিত্য।

এখন ভারতে বসবাসরত বিপন্নতম হিন্দুদের অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বিরাট সংখ্যক হিন্দুর (তার সঙ্গে কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ এবং আদিবাসী) দুর্গতির কথা বলছি।

মুসলিম মানসিকতা এবং তাদের ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন কংগ্রেস নেতৃত্ব ১৯৪৭-এ একদিকে চন্দ্র-সূর্যের চেয়েও সত্য যে দ্বিজাতি তত্ত্ব, তাকে অস্বীকার করেছেন, অপরদিকে ভারত-ভাগ মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সংখ্যালঘু বিনিময়ের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ঠিক সেদিনই জন্ম হয়েছিল উদ্বাস্তু সমস্যার। আজও সে সমস্যার সমাধান হয়নি। যতদিন কোরান-হাদীস অবিকৃত থাকবে ততদিন পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা আসতে থাকবে। এই চরম সত্যটিকে ডান-বাম নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা আজও অস্বীকার করে চলেছেন। এদের মধ্যে

বামপন্থীরা কয়েক কাঠি উপরে। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে ১৯৭১-এর পরে আসা উদ্বাস্তুদের চরম দুর্গতির কথা উচ্চারণও করছেন না। তারা ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া এবং বিরোধীদের আদ্য-শ্রাদ্ধ করতে ব্যস্ত।

হতভাগ্য উদ্বাস্তুদের বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে ফেরত পাঠাবার কোন সুযোগ নেই। অথচ ভারতে তাদের নাগরিকত্ব বা পুনর্বাসনও দেওয়া হচ্ছে না। দুনিয়ার তাবৎ 'সর্বহারাদের উদ্ধারকর্তা' বামপন্থী এবং তাদের অন্ধ অনুগামীদের দৃষ্টির বাইরে এরা। বাংলাদেশে তারা 'কাফের' এবং 'মালাউন'। শেখ হাসিনা যতই মানবিক হোন না কেন, একজন উদ্বাস্তুকেও তিনি ফেরত নেবেন না। অথচ ভারতে তারা অবৈধ আগন্তুক(অনুপ্রবেশকারী)। তাই তারা পৃথিবীর মধ্যে বিপন্নতম মানুষ।

কিন্তু যে কোন বিচারে এই উদ্বাস্তুরা ভারতের স্থায়ী সম্পদ (Permanent Asset)। এই সম্পদকে কাজে লাগাতে না পারলে এরাই কিন্তু স্থায়ী আপদে (Permanent Liability) রূপান্তরিত হয়ে যাবে হয়ক। আর জেহাদের মাধ্যমে যারা ভারতকে মুসলিম ভারতে পরিণত করার অপকর্মে লিপ্ত আছে , অনেকে হয়ত তাদের দলে যোগ দেবে। কারণ, মুসলমান হলে তাদের নাগরিকত্ব আদায়ের ঝামেলা থাকবে না। ও-বি-সি সার্টিফিকেট পেতে বেগ পেতে হবে না। বিপিএল কার্ড পাওয়া যাবে বিনা প্রচেষ্টায়। সর্বোপরি চাকরি পাবার সম্ভাবনা এক লাফে ১০০ গুণ বেড়ে যাবে।

শুধু একাত্তরের পরে আসা উদ্বাস্তুরাই নয়, তার আগে আসা উদ্বাস্তুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরাও ধর্ম পরিবর্তনে উৎসাহ বোধ করবে। যারা কিছুটা খবর রাখেন, তারা জানেন এই পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে প্রতিদিন শত শত মুসলিম ছেলেরা টোপ দিয়ে হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করছে। বোধগম্য কারণে মিডিয়া সব খবর প্রকাশ করতে পারছে না। আমরা যেন স্বামী বিবেকানন্দের সেই সাবধান বাণী ভুলে না যাই। তিনি বলেছিলেন, একজন মানুষ মুসলমান হলে একজন হিন্দুর সংখ্যা কমবে, শুধু তা-ই নয়, প্রতিটি নব-মুসলমান এক একটি শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।

## উপসংহার

দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং অশান্তি পৃথিবীর সব দেশে এবং সব ধর্মেই আছে। কোরানের ভাষায় খোদা বা আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। তিনি পারেন না এমন কোন কাজ নেই। তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত তাঁর প্রিয় নবীকে সঙ্গে নিয়ে ইহ জগতের মুসলমানের দারিদ্র্য দূর করতে পারেননি; কিন্তু তাদের জন্য স্বর্গ (বেহেস্ত) নিশ্চিত করে দিয়েছেন। একজন পুরুষ মুসলমানের জন্য কয়েক গণ্ডা চিরযৌবনা হুরীর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

ভারতের মুসলমানদের একটি অংশ গরীব। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এই দিকটি বাদ দিলে ভারতের মুসলমানরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুখী মানুষ। তাদের ভাগ্য পনেরো কলায় পরিপূর্ণ। দারিদ্র্য দূর হলে তাদের ভাগ্য ষোল কলায় পূর্ণ হবে। আমাদের রাজনীতিবিদরা চাইলে ভারতকে মুসলমানের হাতে তুলে দিতে পারবেন, কিন্তু তাদের দারিদ্র্য দূর করে তাদের ভাগ্যের 'ষোলকলা' পূর্ণ করতে পারবেন না। কারণ, সংরক্ষণ এই জাতীয় সমস্যার সমাধান নয়। মুসলমানদের দারিদ্র্য এবং অনগ্রসরতা দূর করতে হলে সমস্যার মূলে পৌঁছাতে হবে; ভোট ভিখারীর মানসিকতা পরিহার করে নিরপেক্ষ গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে খুঁজে দেখতে হবে আমাদের মুসলমান ভাইদের দুর্বলতা কোথায়।

এ ব্যাপারে গত ১১.৩.২০১০ তারিখে কলকাতার দৈনিক স্টেট্সম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত ডা. এম এ সফিউল্লার মূল্যবান লেখাটি (উত্তর সম্পাদকীয়) আমাদের পথ দেখাতে পারে। তাঁর লেখার শেষ অংশটি হুবহু তুলে দিচ্ছি।

"প্রকৃতপক্ষে প্রয়োগের বিচারে ইসলাম হল স্বৈরতান্ত্রিক সংস্কৃতি যা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। কারণ, গণতন্ত্রে সামাজিক ন্যায় এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব আছে। কিন্তু ইসলামের শাসনতন্ত্র আল্লাহ্‌র। তাই মুসলিমরা আল্লাহ্ এবং কোরানের তৈরি আইন প্রশ্নাতীত ভাবে মেনে চলে তা সমাজের অগ্রগতিতে যতই অবান্তর বা অনুপযুক্ত হোক না কেন। আর এ থেকেই এদের জীবনে নেমে আসে নানা সমস্যা। এরা হয়ে ওঠে সামাজিক অন্যায় আর অর্থনৈতিক শোষণের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ শিকার। সাথে সাথে সবুরে মেওয়া ফলে এই আশায় তারা ভেবে আসছে যে মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তাদের স্বর্গে প্রবেশ নিশ্চিত করে রেখেছেন — ওই স্বর্গ বা বেহেশ্ত্ প্রাপ্তির চেয়ে বড় প্রাপ্তি ইসলামে আর নেই। মুসলিম ধর্মের প্রভাবে ধর্মান্তরিত ভারতীয়রা তাদের পূর্ব পুরুষদের জাতীয়তা বোধ থেকে নিজেদের পৃথক করে নিতে শিখল। আরব দেশকে একান্ত আপন ভেবে এরা মক্কার গুণগান শুরু করল। *(মুক্ত মনের মানুষ বলে বহুল প্রশংসিত কবি নজরুলও বাংলার কুটিরে থেকে 'দূর আরবের স্বপন দেখেছিলেন' — লেখক)* যা কিছু ভারতীয় এবং ভারতের গৌরবের তাই ঘৃণিত হতে থাকল। আরবে অবস্থিত ইসলামের উপাসনালয়গুলি উৎকৃষ্ট এবং এদেশের উপাসনালয়গুলি নিকৃষ্ট মনে করতে থাকল। নিজেদের পূর্বপুরুষদের প্রতিটি কাজ, তারা মুসলিম ছিল না বলে, এদের কাছে অবান্তর, তুচ্ছ এবং ঘৃণ্য মনে হল। এভাবেই নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি পরিপূর্ণ অবজ্ঞা ও ঘৃণা, ভারতকে বিভাজন করতে বাধ্য করল। অথচ সাধারণ মুসলিমদের জীবনযাত্রার মানের কোন পরিবর্তন হল না। দারিদ্র্য আর অভাবক্লিষ্ট মানুষগুলি — ধর্মপ্রদত্ত বেহেশ্তের স্বপ্ন বিলাস নিয়ে আজও দিনযাপন করছে। এখন সময় এসেছে ধর্ম ব্যবসায়ীদের ভেবে দেখবার, তারা তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কী ক্ষতি করে যাচ্ছে।

এ দেশের প্রকৃতি ও ধনসম্পদে আকৃষ্ট হয়ে যুগে যুগে বিদেশীরা হানা দিয়েছে - যাদের সিংহভাগই ছিল মুসলমান। তারা বৃদ্ধি করেছে এদেশের মুসলিম জনসংখ্যা আর হিন্দু-মুসলমান বিভেদ। ভারতের ধনসম্পদের অপব্যয় ঘটিয়ে সৃষ্টি হয়েছে স্মৃতি সৌধ, সিংহাসন কত কি। বিদেশ থেকে আসা সেই সমস্ত শাসকের দল সাধারণ মানুষের জন্য কি করেছিল? তারা প্রতিষ্ঠা করেননি এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা সেরায়তন হাসপাতাল বা ঐ জাতীয় অন্য কিছু যে সবের 'ন্যাশনাল ভ্যালু' (National Value) অপরিসীম এবং অতি সাধারণ মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে সেসব সহায়ক হতে পারে। জি. টি. রোডের মতো মুষ্টিমেয় কিছু সৃষ্টি *(প্রচলিত ধারণা হচ্ছে সম্রাট শেরশাহ্ জি.টি. রোড তৈরী করিয়েছিলেন। কিন্তু সর্বশেষ গবেষণা এই তথ্য অস্বীকার করছে। — দে. রায়)*, রাশি রাশি অনাসৃষ্টির জঙ্গলে হারিয়ে যায়। ধর্মবিশ্বাস বর্ম হয়ে মানুষের মর্মস্থলকে ঢেকে রেখে বিবেকের টুটি চেপে ধরে। তাই মানুষের মৌলিক চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দাবিকে উপেক্ষা করে এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভাবাবেগপূর্ণ দাবি পূরণে বামপন্থী ডানপন্থীদের তৎপরতার ঘটা দেখেও, ওই সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীদের বৃহত্তম অংশ টু শব্দটিও করেন না।"

মুসলিম ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ, ইসলামের দালাল কিংবা অসাধু চিন্তা-চেতনার ধারক ও বাহক না হলে সকলেরই জানার কথা যে, মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে জন্ম, মৃত্যু, খাদ্য এবং সম্পদ (হায়াত, মৌয়াত, রেযেক এবং দৌলত) একেবারেই খোদা বা আল্লাহ্‌র হাতে। খোদা যাকে খুশী যত সম্পদ দেবেন, যাকে খুশী দেবেন না। এ ব্যাপারে মানুষের করার তেমন কিছু নেই। ("... তুমি যাহাকে চাও, বে-হিসাব পরিমাণে রেযেক দান কর।".... and Thou givest sustenance to whom Thou pleasest without measure." — কোরান- ৩/২৭) দুনিয়ার প্রত্যেকটি মুসলিম রাষ্ট্রে সহস্র কণ্ঠে এ কথা প্রচার করা হয়। ব্যতিক্রম শুধু ভারত। হিন্দুদের হিমালয়সম অজ্ঞতা এবং প্রশান্ত মহাসাগরসম দুর্বলতার কারণে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক মোল্লারা বলতে পারছেন যে, ভারতের মুসলমানদের দারিদ্র্যের কারণ হিন্দুদের 'ইনজাস্টিস'। হিন্দু রাজনীতিদিরা আজ ইনজাস্টিসের এই মিথ্যা এবং নোংরা তত্ত্বটি মেনে নিচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এর অগ্রদূত। আজ কমিউনিষ্ট বলে পরিচিত রেজ্জাক মোল্লার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ইমামদের কোন পার্থক্য নেই।

আমরা হিন্দুরা যদি নিম্নতম পৌরুষের অধিকারী হয়ে থাকি তাহলে এই ইমাম-মোল্লাদের কাছে জানতে চাওয়া উচিত কোথায় কবে হিন্দুরা মুসলমানদের উপর ইনজাস্টিস করেছে। তাদের কাছে আরও জানতে চাওয়া প্রয়োজন —

আপনারা কি আজও মানবসভ্যতার কলঙ্ক দ্বিজাতি-তত্ত্ব অস্বীকার করতে পেরেছেন? ১৪০০ বছর আগে রচিত ধর্মতত্ত্ব এবং অর্থনীতি আপনাদের এক

অংশকে ধনাঢ্য করেছে, আর একটি অংশকে গরীব করে রেখেছে। তাদের কাছে আরও প্রশ্ন রাখা উচিত — তারা সব ভারতবাসীকে মানুষ বলে মনে করেন কিনা। ইসলামে তেমন কোন বিধান আছে কিনা। আপনারা ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মকে ধর্ম বলে মানেন কিনা, মাদ্রাসা শিক্ষা যে আপনাদের পিছিয়ে পড়ার একটি বড় কারণ তা মানেন কিনা। আপনারা আজও কেন 'ইউনিফরম সিভিল কোড' মানছেন না? আপনারা কি আজও পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করেন না যে, —

ক) "... একজন ঈমানদার (মুসলমান) ক্রীতদাসী মুশরিকশরীফজাদী (পৌত্তলিক রাজকন্যা) অপেক্ষা অনেক ভাল। ......." (কোরান-২/২২১)

খ) " যাহারা আল্লাহ্, তাহার ফিরেশতাগণ, তাহার পয়গম্বরগণ এবং জিব্রাঈল ও বিকাঈলের শত্রু, আল্লাহ্ স্বয়ং সেই কাফেরদেরও শত্রু।" (কোরান-২/৯৮)

গ) পৃথিবীর বুকে আপনারাই সর্বোৎকৃষ্ট জনগোষ্ঠী। (কোরান-৩/১১০)

এই সব বিধান অনুসারে আপনারা কি ভারতের ৮০ কোটি হিন্দুকে অবিশ্বাসী এবং আল্লাহ্‌র শত্রু বলে মনে করেন না?

মুসলিম লীগের মহম্মদ আলী এবং শওকত আলীকে (এরা সহোদর দু'ভাই) গান্ধীজা নিজের ভাই-এর মত বিশ্বাস করতেন এবং ভালবাসতেন। মহম্মদ আলী কংগ্রেসেও যোগ দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, ১৯২৩-এ তিনি কংগ্রেসের সভাপতিও হয়েছিলেন। এই মহম্মদ আলী ১৯২৪ খৃঃ আজমীঢ়ে এবং আলীগড়ে বলেছিলেন - "গান্ধীজার চরিত্র যত পবিত্রই হোক না কেন, তিনি আমাদের কাছে একজন চরিত্রহীন মুসলমানের চেয়েও নিকৃষ্ট।" এর এক বছর পরে লখনৌ-এর এক জনসভায় তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি এ কথা বলেছেন কিনা। উত্তরে তিনি এর সত্যতা স্বীকার করেন এবং আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন — "আমার ধর্মবিশ্বাস ও রীতি অনুযায়ী একজন লম্পট ও জঘন্য চরিত্রের মুসলমানও আমার কাছে গান্ধীজার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"*

হ্যাঁ, আজও আপনারা একজন লম্পট এবং চরিত্রহীন মুসলমানকে গান্ধীজী অথবা অন্য যে কোন হিন্দুর তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। সেই কারণে যে সব সাম্প্রদায়িক লম্পটেরা প্রতি পলে বাংলাদেশের হিন্দু মহিলাদের ধর্ষণ করছে, তাদের সম্পর্কে নীরব থাকছেন। স্ত্রী-কন্যা ও মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা করার জন্য এবং প্রাণ বাঁচাবার জন্য ১৯৪৬ থেকে আজ পর্যন্ত যে সব হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে এসেছেন, তাদের সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করছেন না। ভারতে আদিবাসী বলে পরিচিত যে সব বনবাসী হিন্দুরা দারিদ্র্যের কারণে জঙ্গলের শাক-পাতা ও পোকা-

---

* "However pure Mr. Gandhi's character may be, he must appear to me from the point of view of religion inferior to any Musalman, even though he be without character." Dr. Ambedkar, Vol. 8, Chapter-XII, p-302.

মাকড় খেয়ে বেঁচে আছেন, তাদের খবর রাখেন না। কারণ, আপনাদের ধর্মশাস্ত্রে তেমন কোন বিধান নেই।

বলুন, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ না কেন বিরাট সংখ্যক মুসলমান চক্রবৃদ্ধি হারে জনসংখ্যা বাড়িয়ে যাচ্ছেন? 'জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি' এই অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রয়োগ করে বেপরোয়া ভাবে জনসংখ্যা বাড়াবেন, ধর্মের দোহাই দিয়ে দারিদ্র্যকে ডেকে আনবেন; আর সংরক্ষণ দিয়ে সেই দারিদ্র্য দূর করে দেবে ভারত সরকার?

কোটি কোটি মুসলমান আজও বিশ্বাস করেন যে, মহানবী নিরক্ষর হয়েও যখন আল্লাহ্‌র সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হতে পেরেছেন এবং দুনিয়ার যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হতে পেরেছেন, তখন আমরা কষ্ট করে ইংরেজী, অঙ্ক, বিজ্ঞান শিখতে যাব কেন? তাদের স্থির বিশ্বাস সম্রাট আকবর যখন নিরক্ষর হয়েও তৎকালীন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ধনী এবং সামরিক দিক দিয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী হতে পেরেছিলেন, তখন আমরা কেন বোকা হিন্দুদের অনুকরণে জেনারেল লাইনে পড়াশোনা করতে যাব? বুকে হাত দিয়ে ইমাম সাহেবরা বলুন, তাদের এই মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য আপনারা কি করছেন?

শিক্ষা জগতের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বেগম রোকেয়ার মৃত্যুর পরে তাঁকে কবরস্থ করার জায়গা জুটছিল না কেন? তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে (বিশেষত মুসলমান মেয়েদের) নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন — এটাই কি তাঁর অপরাধ ছিল না? 'জেন্দাপীর' অভিধায় সম্মানিত সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর দাদা দারাশিকোকে 'কাফের' আখ্যা দিয়ে তাঁর মাথাটি কেটে পিতা শাহ্‌জাহানকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন কেন? দারাশিকো ভারতীয় দর্শনকে সম্মান জানিয়েছিলেন বলে নয় কি? ভারতের বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে কতজন আওরঙ্গজেবের এই তত্ত্ব থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন?

যে কোরানকে আপনারা 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ' বলে গর্ব বোধ করেন সেই কোরানে অমুসলমানদের শিক্ষালাভের কোন সুযোগ আছে কি? আপনারা গর্বের সঙ্গে বলে থাকেন ইসলামই হচ্ছে বিশ্বে একমাত্র ধর্ম যেখানে নারী-পুরুষের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই শিক্ষা যে কোরান-হাদীস ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা, বিজ্ঞান-ভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা নয়, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে কি? মুসলমানরা এই ভারতকে তো প্রায় ৬০০ বছর ধরে সরাসরি শাসন করেছেন। তাঁরা আপনাদের শিক্ষার জন্য ক'টা টাকা খরচ করেছেন? ব্রিটিশ রাজত্বে হিন্দুরা যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন, সেই শিক্ষা আপনারা গ্রহণ করলেন না কেন?

পৃথিবীর ৬২০ কোটি মানুষের মধ্যে অনেক কমিউনিস্ট সহ ৫০০ কোটি অমুসলমান বলছেন, 'সব মুসলমান সন্ত্রাসবাদী নয়; কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের প্রায় সকলেই মুসলমান'। একবার কি ভেবে দেখেছেন কেন এই অপবাদ দেওয়া হচ্ছে আপনাদের?

(প্রসঙ্গত মহামান্য বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার এবং রঙ্গনাথ মিশ্র অনুগ্রহ করে জানাবেন কি, আপনাদের রিপোর্ট তৈরী করার আগে এ সব নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন কি? ভারত সরকার জানাবেন কি, ১৯৪৬ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পাকিস্তান এবং পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে অমুসলমানরা, বিশেষ ভাবে

হিন্দুরা যে কারণে মাতৃভূমি ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন তা খুঁজে বার করার জন্য কেন কোন কমিশন নিয়োগ করা হবে না?)

এ সব মারাত্মক প্রসঙ্গ এবং ঘটনা এড়িয়ে গিয়ে আমাদের রাজনৈতিক নেতারা এবং সরকার ভোটের কারণে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছেন? নাকি জেহাদের ভয়ে? যার জন্যই হোক, ধর্মের ভিত্তিতে তাদের জন্য সংরক্ষণের সহজ অর্থ হল অদূর ভবিষ্যতে ভারতকে মুসলমানদের হাতে তুলে দেওয়া।

কোরান-হাদিসের কোন পরিবর্তন সম্ভব নয় বলেই মুসলমানদের খুব বড় একটি অংশ ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে স্থায়ী বিপদের (Permanent Danger) কারণ হয়ে থাকবে। ধর্মের ভিত্তিতে বা মুসলমান হিসেবে সংরক্ষণ বা বিশেষ আর্থিক সুবিধা দিতে গিয়ে এদের তো আলাদা করা সম্ভব হবে না। যতক্ষণ এদেরকে ভারতের 'স্থায়ী সম্পদে' (Permanent Asset) রূপান্তরিত করা না যায় ততক্ষণ পাইকারী হারে তাদের সংরক্ষণ বা বিশেষ আর্থিক সুবিধা দিলে ধ্বংসকে ডেকে আনা হবে মাত্র। ১৬ থেকে ৩২ বছর বয়সের মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাংকের মাধ্যমে শতকরা ৩ টাকা হার সুদে 'শিক্ষা ঋণ' দিলে এবং সংখ্যাগুরু সমাজের অনুরূপ অবস্থা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের ঐ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলে সার্বিক অবস্থার যে অবনতি ঘটবে তাতে কোন সন্দেহ আছে বলে মনে করি না।

আমরা বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব, রামকৃষ্ণপন্থী, প্রণবানন্দপন্থী, মতুয়াপন্থী এবং আস্তিক ও নাস্তিক নির্বিশেষে ভারতের প্রতিটি হিন্দুকে এই ব্যাপারটি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে অনুরোধ করছি। আপনারা যদি নীরব থাকেন তাহলে হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটবে।

## মাদ্রাসা শিক্ষা প্রসঙ্গে

"ভারতের জন্য আমরা সেই শিক্ষা ব্যবস্থা চাই যে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিভূমি হবে দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা এবং পরধর্ম সহিষ্ণুতা।" — ড. বি.আর. আম্বেদকর স্টাডি সার্কেল।

বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী কমরেড অসীম দাশগুপ্ত গত ২২.৩.২০১০ তারিখে আগামী বছরের রাজ্য বাজেটে মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে খরচের পরিমাণ গত বছরের তুলনায় আড়াই গুণ করে দিয়েছেন, ১২১ কোটি থেকে ৩০০ কোটি টাকা। এর কারণ দর্শাতে গিয়ে মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, মাদ্রাসাগুলোতে ভোকেশনাল এবং টেকনিক্যাল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে এবং সার্বিক ভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার মানের উন্নয়ন ঘটানো হবে, যাতে সংখ্যালঘু সমাজের ছাত্র-ছাত্রীরা চাকরি ক্ষেত্রে আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা পায় এবং তাদের আয় বাড়ে।

মাদ্রাসা জিনিসটা কি? সেখানে কী কী বিষয় পড়ানো হয়? সেখানে এখন যা পড়ানো হয়, তার মধ্যে ভোকেশনাল এবং টেকনিক্যাল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে 'যে উদ্দেশ্যে মাদ্রাসার সৃষ্টি' তার কতটুকু পরিবর্তন হবে? ছাত্র-ছাত্রীরা ইসলাম প্রেমিক খাঁটি মুসলমান না হয়ে কতটুকু খাঁটি ভারত প্রেমিক মানুষ হবে? এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার উদ্দেশ্যে এই নিবন্ধের অবতারণা।

বাংলাদেশের মুক্ত মনের বুদ্ধিজীবী মি. সালাম আজাদ লিখেছেন, "মাদ্রাসা থেকে যে লাখ লাখ ছেলে মেয়েরা বেরুচ্ছে তারা তো পঙ্গু, .... বাঙালী জাতির জন্য ভয়ঙ্কর। কারণ তাদেরকে এই শিক্ষা দিয়ে বের করা হচ্ছে, মুসলমান হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। সে মুসলমান খুন করুক, ধর্ষণ করুক, রাহাজানি করুক, তবুও সে শ্রেষ্ঠ। মুসলমান বলেই শ্রেষ্ঠ। তাদের যে কাল্পনিক বেহেস্ত রয়েছে সেই বেহেস্তে মুসলমান ছাড়া অন্য কারও প্রবেশাধিকার নেই। আর যে মুসলমান নয়, সে কাফের। কাফের হত্যা করলে পাপ নেই। বরং পুণ্য। বেহেস্ত কাফের হত্যাকারীর জন্য উন্মুক্ত। এ সবই তো শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে মাদ্রাসাগুলোতে।" (সালাম আজাদের 'ভাঙা মঠ', জুন, ০৪, পৃ-৫৪, বাইণ্ডিং সংস্করণ।)

একটু খোঁজ নিলেই দেখা যাবে মাদ্রাসা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কোরান, হাদীস এবং ইসলামের ইতিহাস (যার অনেকটাই মনগড়া) শিখিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পাক্কা মুসলমান তৈরী করা। ক্ষেত্র বিশেষে 'জেহাদী মুসলমান' তৈরী করা। বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা এ সব জানেন না, তা হতে পারে না। জানেন; অবশ্যই জানেন। তা হলে এ সব ধ্বংসাত্মক কাজ তারা করছেন কেন?

জন্মলগ্ন থেকে ১৯৭৭-এ পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা লাভের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের বামপন্থী নেতা-কর্মীরা সহস্র কণ্ঠে বলতেন 'ধর্ম জনগণের আফিম'। বস্তু আফিম যেমন মানুষকে বেশ কিছু সময়ের জন্য অজ্ঞান করে রাখে, ধর্ম আফিম তার চেয়ে হাজার গুণ সময় ধরে মানুষকে অজ্ঞান করে রাখে। এর ফলে শোষক সমাজ তাদের শোষণের কাজ নিরাপদে চালিয়ে যেতে পারে। অনেক কমিউনিষ্টদের মতে ইসলাম ধর্ম সবচেয়ে শক্তিশালী আফিম। এই আফিম খাইয়ে কোটি কোটি শ্রমজীবী সাধারণ মুসলমানকে শোষণ করছে মুষ্টিমেয় মুসলিম শাসক এবং তাদের চামচে মোল্লা-মৌলভীরা। তাই কমিউনিষ্টরা নিজেরা কোন ধর্ম পালন করবেন না এবং সাধারণ মানুষকে ধর্মাচরণে নিরুৎসাহিত করবেন। তারা ক্ষমতায় গেলে সরকারী তহবিল থেকে ধর্মীয় খাতে এক পয়সাও খরচ করবেন না, তা সে ইসলাম, হিন্দু বা যে কোন ধর্মই হোক না কেন।

বামফ্রন্ট ক্ষমতা লাভের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে সরকার স্বীকৃত মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ২৩৮-টি। তারপর আজ পর্যন্ত বামফ্রন্ট আরও ২৬৯-টি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাহলে এখন সরকার-স্বীকৃত মাদ্রাসার সংখ্যা ৫০৭-টি। অদূর

ভবিষ্যতে আরও ৫০০-টি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে আমাদের 'চোখের মণি' 'নাস্তিক্য দর্শনে বিশ্বাসী' বামফ্রন্ট সরকার। এর বাইরে অর্থাৎ স্বীকৃতিবিহীন মাদ্রাসার সংখ্যা ৫০০০-এর কম নয়। এগুলিকে বলা হয় খারিজী মাদ্রাসা। এর বাইরেও আছে হাজার হাজার অলিখিত মাদ্রাসা। কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন এগুলো আবার কি? এগুলো হচ্ছে 'মসজিদ'। কমিউনিষ্ট, বিপ্লবী ও বিদ্রোহী কবি নজরুলের ভাষায় 'খোদার ঘর'। আমাদের রাজ্যে এরূপ কতগুলি খোদার ঘর আছে, স্বম্ভবত স্বয়ং খোদা ছাড়া আর কেউ বলতে পারবেন না। প্রতিটি মসজিদই কিন্তু এক একটি মাদ্রাসা। ঘোষিত মাদ্রাসায় ১২ বছর ধরে যা শেখানো হয়, তার মূল কথা 'ক্রিম' শেখানো হয় মসজিদ নামের অঘোষিত মাদ্রাসায় প্রতি শুক্রবার খুতবা পাঠের মাধ্যমে। ঈদের সময় হয় বিশেষ খুতবা। একটু পরে আমরা একটি খুতবার বয়ান উল্লেখ করব।

১৯৭৭-এ মাদ্রাসা খাতে বরাদ্দ ছিল ৫ লাখ ৬ হাজার টাকা। ২০০০-২০০১-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১৫ কোটি টাকায়। আজ হল ৩০০ কোটি। আসুন এক ঝলকে আমরা দেখে নিই যে মাদ্রাসার জন্য এত টাকা বরাদ্দ করা হল সেই মাদ্রাসায় ছাত্র-ছাত্রীদের কী কী শেখানো হয়। যা শেখানো হয় তাতে ভারত কতটা শক্তিশালী হতে পারে। কিংবা কমিউনিজম কতটা পোক্ত হতে পারে।

দুনিয়ার সর্বত্রই মাদ্রাসা শিক্ষার মূল বিষয়গুলি হচ্ছে —

১। অন্তর দিয়ে এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণে কোরান পাঠ।

২। ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের যথাযথ ব্যাখ্যা।

৩। ইসলামী বিচার ব্যবস্থা।

৪। শরিয়তি (মুসলিম) আইন।

৫। পবিত্র মহানবীর জীবনী ও বাণী (হাদীস)।

৬। মুসলিম দর্শন।

৭। প্রাথমিক অঙ্কশাস্ত্র।

৮। আল্লাহ্‌র বাণী-মাহাত্ম্য প্রচার (তাবলীগ)।

মাদ্রাসায় ইসলামের যে সব বিধি-বিধান শেখাতেই হবে তার কয়েকটি হচ্ছে —

ক) ইসলাম ধর্ম শান্তির ধর্ম। ইহা আল্লার একমাত্র মনোনীত ধর্ম এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

খ) মুসলমানরাই সমস্ত জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি। কোরান নির্ভুল, মহা পবিত্র এবং পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর গ্রন্থ। যারা কোরান মেনে চলবে না, তারাই কাফের। হিন্দু এবং অন্যান্য পুতুল পুজারীরা অপবিত্র।

গ) নবী মহম্মদ মহান আল্লাহ্‌র প্রেরিত শেষ এবং শ্রেষ্ঠ নবী। পৃথিবীতে আজ

পর্যন্ত যত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলেন এই নবী মহম্মদ। তাঁর চরিত্র নিষ্কলুষ। মানব জাতির মধ্যে তিনিই একমাত্র আদর্শ পুরুষ।

ঘ) সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ নিরাকার। তিনি হলেন স্বর্গ ও ভূমণ্ডলের আলো। তার মা-বাবা-স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন কেউ নেই। তিনি পবিত্রতম একক সত্তা; সর্বশক্তিমান। তার কোন অংশীদার নেই। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় পাপ হচ্ছে 'আল্লাহ্‌র শরীক বা অংশীদার আছে' এমন কথা বলা। অন্য সব পাপের ক্ষমা আছে; কিন্তু এই পাপের কোন ক্ষমা নেই।

ঙ) এই বিশ্ব এবং মহাবিশ্বের একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ্ এবং তার রাসূল পবিত্র মহানবী।

চ) এই পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের মালিক এবং পৃথিবীকে শাসন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র নেক (সৎ) বান্দাদের। অর্থাৎ মুসলমানদের।

ছ) এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই। নবী তাঁর জীবনের শেষ ভাষণেও (বিদায় হজ) এই ফতোয়া দিয়ে গেছেন।

জ) সমগ্র পৃথিবী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে — দারুল ইসলাম ও দারুল হার্ব। যে দেশের শাসনকর্তা মুসলমান সে দেশকে বলে দারুল ইসলাম এবং যে দেশের শাসন কর্তা অমুসলমান সে দেশকে বলে দারুল হার্ব। শক্তিশালী মুসলিম শাসকের কর্তব্য হচ্ছে দারুল হার্বকে দারুল ইসলামে পরিণত করা। এই কাজের জন্য তিনি জেহাদের ডাক দিতে পারবেন। প্রত্যেকটি সক্ষম মুসলমান এই ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য। জেহাদে অংশগ্রহণ করার আহ্বান যদি কোন মুসলমান প্রত্যাখ্যান করে তাহলে সে যত পুণ্যের কাজই করুক না কেন মৃত্যুর পরে স্বর্গে যেতে পারবে না। পক্ষান্তরে জিহাদে গিয়ে মৃত্যু বরণ করলে সে তক্ষুণি স্বর্গে চলে যাবে। তাকে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না।

(দেওবন্দী চিন্তাধারায় 'দ্বীনি মাদ্রাসা' নামে এক প্রকার মাদ্রাসা আছে। এই সব মাদ্রাসায় সবচেয়ে বেশি জোর দিয়ে শেখানো হয় জেহাদ তত্ত্ব এবং তার মাহাত্ম্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন আফগানিস্তান আক্রমণ করে, তখন পাকিস্তানের প্রধান সামরিক শাসনকর্তা মি. জিয়াউল হক পাক-আফগান সীমান্ত বরাবর অনেকগুলি দ্বীনি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই সব মাদ্রাসায় যে সব জিহাদী তৈরী হয় তারা সরাসরি স্বর্গে গিয়ে চিরযৌবনা ও পিনোন্নতা পয়োধরা হুরীদের সঙ্গে চিরশান্তিতে বসবাস তথা যখন তখন সহবাস করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ভালবাসে।)

জ) পৃথিবীতে একমাত্র মহাসত্য হচ্ছে ইসলাম। মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে দুনিয়ার সব মানুষকে মুসলমান বানানো। প্রথমে ভদ্রভাবে অমুসলমানদের মুসলমান হবার জন্য আহ্বান জানাতে হবে। এই আহ্বানে সাড়া না দিলে তাদের বিরুদ্ধে

'ধর্মযুদ্ধ' শুরু করতে হবে। এই ধর্মযুদ্ধের নাম 'জিহাদ' বা 'জেহাদ'।

ঝ) প্রত্যেকটি মুসলমান, এমনকি মৃত্যুর এক মুহূর্ত আগেও যে মুসলমান হয়েছে, সেও শেষ পর্যন্ত স্বর্গে যাবে।

ঞ) আল্লাহ্ হযরত মহম্মদ সহ মোট ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবী পাঠিয়েছেন এই পৃথিবীতে। এদের মধ্যে একজনও ভারতে জন্ম গ্রহণ করেননি।

## মুসলমান বা অমুসলমান কেউই যে সব কথা বলতে পারবে না এবং যে সব কাজ করতে পারবে না

১। ইসলাম, আল্লাহ্ এবং নবীর বিরূপ সমালোচনা করা যাবে না। কোন মুসলমান এমন কাজ করলে তাকে 'মুরতাদ' ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।

২। আল্লাহ্‌র বাণী কোরান এবং নবীজীর বাণী হাদীসে কোন অবৈজ্ঞানিক বা খারাপ বিধান আছে — এমন কথা বলা যাবে না।

৩। ইহুদি এবং খৃষ্টানদের বন্ধু বলে গ্রহণ করা যাবে না।

৪। নিজের মা-বাবাকেও বন্ধু বলে গ্রহণ করা যাবে না যদি তারা অন্য ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

৫। হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবী ও মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কেন অনেক আগেই কোরান পাঠান নাই — এমন প্রশ্ন করা যাবে না।

৬। কোন মুসলমান মহিলা যে কোন সময় তার স্বামীর যে কোন ইচ্ছা পূরণে বিন্দুমাত্র দেরী করতে পারবে না।

৭। শান্তির ধর্ম ইসলাম পৃথিবীর কোথায় কোথায় শান্তি স্থাপন করতে পেরেছে — এমন প্রশ্ন করতে পারবে না কেউ।

৮। নবীজী রাষ্ট্রপ্রধান, সামরিক বাহিনীর প্রধান, সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক, সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সবচেয়ে প্রিয়পাত্র হয়েও কেন আরব থেকে দারিদ্র্য দূর করতে পারলেন না, সে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

৯। মৃত্যুর পরে স্বর্গে গিয়ে দৈনন্দিন জীবনে যে 'শাহী খানা' (রাজসিক খাবার) এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য যা যা পাওয়া যাবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেগুলো যে একেবারেই ভাঁওতা — এ কথাও বলা যাবে না।

মুসলিম দুনিয়ায় প্রতি শুক্রবার জুম্'আ নামাজের পরে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহায় খুতবা পাঠে মুসলমানরা আল্লাহ্‌র কাছে যা বলেন —

"হে আল্লাহ্, ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদেরকে চিরকাল জয়যুক্ত করুন। আর অবাধ্য কাফের, বেদআতী ও মোশরেকদেরকে সর্বদা পদানত এবং পরাস্ত

করুন। হে আল্লাহ্! যে বান্দা তোমার আজ্ঞাবহ হবে, তাঁর রাজ্য চির অক্ষয় রাখুন, তিনি রাজার পুত্র রাজা হউন, কিম্বা খাকান পুত্র খাকান হউন, ....হে আল্লাহ্! আপনি তাঁকে সর্ব দিক দিয়া সাহায্য করুন, ....হে আল্লাহ্! আপনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক, রক্ষক ও সাহায্যকারী হোন। তাঁরই তরবারী দ্বারা—বিদ্রোহী, মহাপাতকী, অবাধ্যদের মস্তক ছেদন করে নিশ্চিহ্ন করে দিন। .....হে আল্লাহ্! আপনি ধ্বংস করুন, কাফেরদের, বেদায়াতী ও মোশরেকদের।"

(দেখুন-কলকাতার 'হরফ' প্রকাশিত 'মুসলিম পঞ্জিকা', বঙ্গাব্দ-১৪০৭, পৃ-১৬০)

এখানে লক্ষ্য করার ব্যাপার এই খুতবা পাঠে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের প্রায় সকলেই মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন — সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত টাকায় 'দান-ছত্র' খুলে বামফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষায় যে পরিবর্তন আনার কথা বলছেন তা কি আদৌ সম্ভব? পরিবর্তন আনতে হলে তো কোরান হাদীসের পরিবর্তন করতে হবে সর্বাগ্রে। তা কি সম্ভব? আমরা বলছি মোটেই সম্ভব নয়। অসীমবাবু খুব পরিচ্ছন্ন ভাবে মুসলিমদের বুঝিয়ে দিলেন আমরা কত দুর্বল।

মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণের নামে সরকার যা বলছেন বা যা করছেন তা তোষণ-ভিত্তিক রাজনীতির ভেলকিবাজি ছাড়া কিছুই নয়। কিছু ইংরেজী, অঙ্ক এবং বিজ্ঞান পড়িয়েই নাকি জঙ্গি তৈরীর কারখানাকে মানুষ তৈরীর কারখানায় রূপান্তরিত করা হবে। সরকারী এবং সরকার স্বীকৃত মাদ্রাসায় তো সরকার বাহাদুর মুক্ত হস্তে প্রসাদ বিতরণ করছেন। এর সঙ্গে অস্বীকৃত খারিজি মাদ্রাসায় দু'জন শিক্ষকের ব্যয়ভার বহন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমাদের সেকুলার ও কমিউনিষ্ট সরকার। একজন শিক্ষক পড়াবেন ধর্মতত্ত্ব এবং অন্যজন পড়াবেন বিজ্ঞান। কথায় কথায় যারা পরিবর্তনের কথা বলেন সেই সব উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরাও বলছেন, মাদ্রাসা শিক্ষা থাকুক, তবে আধুনিক হোক। মাননীয়া রেলমন্ত্রী এবারের রেল বাজেটে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের রেল ভাড়া মওকুব করে দিয়ে আধুনিকীকরণের শুভ সূচনা করলেন। কিন্তু এটা যে চরম অশুভ সূচনা তা বুঝতে মমতাদির বুঝতে খুব দেরী হবে না।

ধরুন, সরকারী প্রস্তাব অনুসারে প্রতিটি খারিজী মাদ্রাসায় দু'জন করে শিক্ষক নিয়োগ করলেন সরকার বাহাদুর। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের কাছে পৃথিবীর উৎপত্তি রহস্য জানতে চাইল। ইসলাম ধর্মতত্ত্বের শিক্ষক বলবেন, এই বিশ্ব এবং মহাবিশ্বের মালিক সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্ এই বিশ্ব এবং মহাবিশ্ব তৈরী করেছেন। তিনি বলেছেন 'কুন' অর্থাৎ 'হও'। অমনি নিমেষের মধ্যে তা হয়ে গেছে। (কোরান- ২/১১৭ এবং ১৯/৩৫) "... তিনি ৬ দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, ..." (কোরান- ৭/৫৪) তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে (কোরান-৪১/৯) এবং চারদিনের মধ্যে এতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। (কোরান-৪১/১০)

এর পর বিজ্ঞানের শিক্ষক ক্লাসে এলেন। তার কাছে ছাত্র-ছাত্রীরা একই বিষয় জানতে চাইল। শিক্ষক সাহেব বিজ্ঞান মনস্ক হলে পূর্বোক্ত শিক্ষক যা বলে গেছেন ঠিক তার বিপরীত কথাই বলবেন। তখন কি মজাই না হবে! যে মজা হবে তাতে আমাদের দেশের 'কমিউনিজম' এবং 'গান্ধীজম' তর তর করে এগিয়ে যাবে।

সুধী পাঠকবৃন্দ, একটু আগে আমরা জনাব এম এ সফিউল্লার লেখা উদ্ধৃত করে ভারতে মুসলমানদের অনগ্রসরতার কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। খারিজি অখারিজি নির্বিশেষে সব মাদ্রাসায় কোরান ও হাদীস থেকে যে কথা পড়াতেই হবে তা বলার চেষ্টা করেছি। আসুন, মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ ভাবে খারিজি মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে আমরা আর একজন মুক্তমনের চিন্তাবিদ বহরমপুরের (মুর্শিদাবাদ, পঃ বঃ) গিয়াসুদ্দিন সাহেবের মতামত জেনে নিই। তাঁর একটি মূল্যবান লেখা প্রকাশিত হয়েছে গত ২৪.৭.২০০৭ তারিখের দৈনিক স্টেট্‌সম্যান পত্রিকায়। নাম — 'মাদ্রাসার জেহাদি শিক্ষায় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিপন্ন'। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, লেখক ড. আম্বেদকরের বলা কথাই বলেছেন, তাঁর নিজের ভাষায়। গিয়াস সাহেব বলেছেন, "সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিছু খারিজি মাদ্রাসার দু'জন শিক্ষকের ব্যয়ভার বহন করবে। এই দু'জনের একজন ধর্মতত্ত্ব শেখাবেন, অন্যজন বিজ্ঞান। যে মাদ্রাসায় সরকারের তিল পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ নেই সেখানে বিজ্ঞানের শিক্ষক শুধু খাতা কলমেই থাকবে, বাস্তবে তার অস্তিত্ব থাকবে না। আসলে এটা সরকারের এক নির্লজ্জ প্রতারণা। খারিজি মাদ্রাসার আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে এ কথা বলা ছল মাত্র। *(বস্তুত যে শিক্ষার ভিত্তিভূমি কোরান এবং হাদিস সে শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ হয় না। — দে. রায়)* খারিজি মাদ্রাসার আংশিক ব্যয়ভার বহন করার এই সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রের পক্ষে আত্মঘাতী হবে এবং এর ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আরও বিপন্ন হবে।

আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ইসলামী মৌলবাদী ও জঙ্গি সংগঠন এবং তাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের সঙ্গে এদেশের কিছু কিছু খারিজি মাদ্রাসার যোগ বিদ্যমান তা সুবিদিত। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্বয়ং সে কথা জানেন এবং ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে কয়েকবারই প্রকাশ্যে সে কথা তিনি প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছেন। ২৪ জানুয়ারি মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, "সব মাদ্রাসা নয়, আই রিপিট, কিছু মাদ্রাসায় জাতীয়তাবিরোধী প্রচার হচ্ছে এবং তার নির্দিষ্ট খবর আমাদের কাছে আছে। সেটা আমরা কখনই করতে দিতে পারি না।" ২৮ জানুয়ারি ডোমকলে সাংবাদিকদের বলেন, "অনুমোদন না থাকা বেসরকারী মাদ্রাসাকে মূল স্রোতের সঙ্গে মিলতে হবে। তাদের মাদ্রাসা বোর্ডের অনুমোদন নিতে হবে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল মাদ্রাসা ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত পিছু হঠলেন। শুধু তাই নয়, মোল্লা, মুফতি এবং বুদ্ধিজীবীদের ডেকে একটি সভায় অলিখিত একটি প্রতিশ্রুতিও (মুচলেকা?)

দিয়েছিলেন।...... কিন্তু চোখ বন্ধ করলেই প্রলয় বন্ধ হয় না। মুখ্যমন্ত্রী সেদিন মাদ্রাসার প্রতি তাঁর সতর্ক ও অনুসন্ধানী চোখ বন্ধ করলেও কিছু মাদ্রাসা তাদের কার্যক্রম বন্ধ করেনি। তাইতো পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ ইসলামী জঙ্গীদের নিরাপদ বিচরণভূমি হয়ে উঠতে পেরেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে জঙ্গিদের নেটওয়ার্ক বিস্তার ও স্থাপনে কলকাতা আজ প্রশস্ত ও নিরাপদ করিডর হয়ে উঠেছে। এই তো সেদিন জালালুদ্দিন ও তার পাঁচ সাকরেদ ধরা পড়েছে যারা হুজির (হরকত-উল-জেহাদ-ই ইসলামি) সদস্য। এটি একটি ভয়ঙ্কর জঙ্গি সংগঠন এবং এটি আল কায়দার শাখা সংগঠন।.....

জালালুদ্দিনের স্বীকারোক্তি থেকে জানা গেছে, সে মসজিদ ও মাদ্রাসা থেকে জঙ্গি সংগ্রহ করত।..... প্রকৃত ঘটনা হল, ইসলাম ধর্মে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের ইতিহাসে জেহাদের ভূমিকা এত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ যে, জেহাদ ব্যতীত ইসলামী পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ করা অসম্ভব। সুতরাং মাদ্রাসায় যে জেহাদ সম্পর্কে পাঠদান করা হয়, তাতে সংশয়ের বিশেষ অবকাশ নেই। এই পাঠ নিতে নিতে তাই মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মানসভূমিতে জেহাদিদের প্রতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হওয়া খুব স্বাভাবিক। কারও কারও মধ্যে জেহাদি হয়ে আল্লার পথে জেহাদ করার বাসনা তৈরী হওয়াও স্বাভাবিক। এসব যে কেবল শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতে পারে তা নয়। মাদ্রাসার শিক্ষক তথা মৌলানা মুফতিদের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। সেজন্যই আইএসআই এবং জঙ্গি সংগঠনগুলো কিছু মাদ্রাসায় তাদের সাংগঠনিক জাল বিস্তার করতে সক্ষম হয়। জালালুদ্দিনের পক্ষেও সম্ভব হয় মসজিদ ও মাদ্রাসা থেকে জঙ্গি সংগ্রহ করে দলে দলে দফায় দফায় প্রশিক্ষণের জন্য পাকিস্তানে পাচার করা। .....

এই রাজ্যে হাজার হাজার মাদ্রাসায় যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় সেই অর্থ কোথা থেকে আসে? শুধু জাকাত, ফিতরা, ওসর প্রভৃতি উৎস থেকে এত অর্থ আসা সম্ভব? এ তো সকলের জানা গোপন তথ্য যে, সৌদি আরব এবং জঙ্গি সংগঠনগুলো থেকে প্রাপ্ত মোট অর্থেই বহু মাদ্রাসার তহবিল স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়। এই মাদ্রাসায় বাইরে থেকে কি শুধু অর্থই আসে, সঙ্গে প্যান ইসলামিজমের মন্ত্র আসে না? .... অনেক মাদ্রাসা আছে যাদের পাঠ্যপুস্তকেই আছে দেশবিরোধী শিক্ষা।.... শিশুদের শব্দভাণ্ডার তৈরী করা হয় বাংলা শব্দের বদলে আরবি শব্দ দিয়ে। শেখানো হয় অ-এ অজু, আ-এ আল্লাহ। ওরা যে বাঙালি ও ভারতীয় তা না শিখিয়ে প্রথমেই শেখানো হয় ওরা সর্বাগ্রে মুসলমান।...... শিশুদের বর্ণমালা শেখানোর প্রথম পাঠেই ঢোকানো হয় শরিয়ত, জেহাদ, মুজাহিদের মতো ভারী ভারী শব্দ। ছ-এ ছড়া শেখে আল জেহাদের, ব-এ বীর মুজাহিদ চলছে ছুটে। যারা জেহাদ করে তাদের মুজাহিদ বলা হয়। ভারতের সংবিধান না শরিয়ত — কোনটাকে তারা শ্রদ্ধা করবে কোনটাকে অশ্রদ্ধা করবে তাও শিখিয়ে দেওয়া হয় ঐ বর্ণমালা পরিচয়ের পাঠেই। ওরা শেখে শ-এ শরিয়তের বিধান আনো। সিভিল কোডে পতন জেনো। এরা বড় হয়ে জেহাদি হবে, নিদেন পক্ষে জেহাদিদের সহকারী হবে তা

নিয়ে কোন সংশয় থাকার কথা নয়। তাই লাদেন, মোল্লা ওমরদের প্রতি ওদের ঘৃণা নয়, তৈরী হয় অসীম শ্রদ্ধা ও আস্থা।

এরূপ পাঠ্যসূচী ও পাঠ প্রদানের কারণে মাদ্রাসাগুলিতে দেশবিরোধী কাজের পরিবেশ ও ক্ষেত্র তৈরী হয়। ফলে আইএসআই এবং আল কায়দা ও তালিবান সহ অন্যান্য মুসলিম সংগঠনগুলোর এইসব মাদ্রাসায় প্রবেশ করার আস্তানা গেড়ে বসার ক্ষেত্রটা পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়ে ওঠে। বাকি থাকে শুধু অনুঘটকের কাজটা। আর অর্থ ছড়ালেই যে অনুঘটক জুটে যায় তা তো বলাই বাহুল্য। এই অনুঘটকদের অনেকেই হিন্দু সম্প্রদায় থেকে আসে। .... এর ফলে আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হওয়ার পরিবর্তে ক্রমশ অনিশ্চিত ও দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। জম্মু কাশ্মীর বিধানসভা ভবন ও সংসদ ভবনে জঙ্গি হামলা প্রমাণ করেছে জঙ্গিদের লক্ষ্যবস্তু শুধু হিন্দুরাই নয়, রাষ্ট্রনেতাগণ ও রাষ্ট্রও। এর থেকে বোঝা যায় আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কত বড় বিপদ ও চ্যালেঞ্জের মুখে। এ হেন পরিস্থিতি যখন বিরাজমান তখন ইউপিএ ও বামফ্রন্ট সরকার যৌথভাবে খারিজি মাদ্রসার দু'জন শিক্ষকের ব্যয়ভার বহন করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিপদকে আরও বৃদ্ধি করবে। অপরদিকে এই সিদ্ধান্ত মুসলমানদের কোনও কল্যাণ বহন করবে না, মোল্লাতন্ত্রের হাতকেই শক্তিশালী করবে।"

সরকার খারিজি মাদ্রাসায় কোন শিক্ষক নিয়োগ না করলেও অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হবে না। কারণ, যারা এই সব মাদ্রাসা পরিচালনা করে তাদের এতটুকু অর্থাভাব নেই। সেক্ষেত্রে আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীকে সাবধান করে দিই, এই মোল্লাতন্ত্র যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে নরকে পরিণত করেছে, ভারতকেও ঠিক তেমনি নরকে পরিণত করবে। হিন্দুদের তো বটেই, সাধারণ মুসলমানদেরকেও এই নরকে পচে মরতে হবে। এখানে ভাল থাকবে সেই সব মোল্লারা যারা প্যান ইসলামের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে মহানবীর দোহাই দিয়ে প্রচার করছে —

ক) দারিদ্র্য মানুষের কাছে হেয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে প্রশংসনীয়। —সগীর।

খ) ক্ষুধা কমাও। কারণ, এ জগতে যারা ভরা পেটে থাকিবে, পরজগতে তাহাদের অধিকাংশই অনাহারে থাকিবে। — তিরমিজী।

গ) যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত বা ক্ষুধা নিবারণে অসমর্থ অথচ লোকের কাছে তাহা গোপন রাখে, মহিমময় আল্লাহ্ তাহাকে এক বছরের আহার্য দান করেন। — তিরমিজী।

এই ৩-টি হাদীস (মহানবীর অভ্রান্ত বাণী) এবং অনুরূপ হাদীসের জন্য
দেখুন - কলকাতার হরফ প্রকাশনীর হাদীস শরীফ, ১৯৬৯, পৃ-৭৭-৭৯।

# ড. আম্বেদকরের দৃষ্টিতে
# ভারত আক্রমণকারী মুসলমানদের ধ্বংসলীলা

[ Translated from Dr. Ambedkar's 'Pakistan or The Partition of India', published by Govt. of Maharastra in 1990, pp- 54-63]

"একমাত্র ধর্মবেত্তা হানিফা, আমরা যার মতবাদ অনুসরণ করি, হিন্দুদের ওপর জিজিয়া প্রয়োগ করতে আদেশ দিয়েছেন (*তাদের বেঁচে থাকার বিনিময়*)। অপর ধর্মবেত্তাগণ বলেছেন; হিন্দুদের 'ইসলাম ধর্মগ্রহণ অথবা মৃত্যু' ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই।" — *কাজী মুগিসউদ্দিন।*

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উত্তর পশ্চিমের মুসলমান যাযাবর শ্রেণীর ভারত আক্রমণ। মহম্মদ-বিন-কাশিমের নেতৃত্বে আরবীয়দের ভারত আক্রমণ। ৭১১ খৃঃ এই ঘটনা ঘটে। আক্রমণকারীরা সিন্ধু জয় করেন। অবশ্য এর ফলে ভারতের কোন স্থায়ী মুসলমান রাজত্ব তৈরি হয়নি। কারণ এই আক্রমণ যাঁর আদেশে করা হয়, সেই বাগদাদের খলিফা নবম শতাব্দীতে সুদূর সিন্ধু প্রদেশ থেকে তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেন। এর পর ১০০১ খৃঃ গজনির মাহমুদ বেশ করেকবার ভারত আক্রমণ করেন। ১০৩০ খৃঃ মাহমুদের মৃত্যু হয়। কিন্তু মাত্র ৩০ বছরের রাজত্বকালের মধ্যে তিনি ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। মাহমুদের পর ১১৭৩ খৃঃ ভারত আক্রমণ করেন মহম্মদ ঘোরি। ১২০৬ খৃঃ তিনি নিহত হন। ৩০ বছর ধরে মামহুদ যেমন ভারতকে বিধ্বস্ত করেন, একই ভাবে সেই ভূমিকা পালন করেন মহম্মদ ঘোরি। এরপর ১২২১ খৃঃ ঘটল চেঙ্গিজ খানের নেতৃত্বে মোঙ্গলদের বহিরাক্রমণ। তাঁরা তখন ভারতের সীমান্তে হানা দিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেননি। কুড়ি বছর পর, লাহোরে প্রবেশ করে তাঁরা ধ্বংসের তাণ্ডব চালান। ১৩৯৮ খৃঃ তৈমুরের নেতৃত্বে বহিরাক্রমণ ছিল এই পর্যায়ের ভয়ঙ্করতম ঘটনা। তারপর ১৫২৬ খৃঃ আর এক আক্রমণকারীর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করলেন বাবর। সেটাই শেষ নয়, আরও দু'টি আক্রমণ ঘটল। ১৭৩৮ খৃঃ ঘটল উত্তাল সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মত নাদির শাহের পাঞ্জাব আক্রমণ; আর ১৭৬১ খৃঃ পানিপথে মারাঠা শক্তিকে বিচূর্ণ করে ঘটল আহম্মদ-শাহ-আবদালির ভারত আক্রমণ। এই আক্রমণে হিন্দুদের প্রতিরোধের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

শুধুমাত্র লুঠতরাজ কিংবা জয়ের আকাঙ্খাই মুসলমানদের এই সব আক্রমণের কারণ ছিল না। এর পিছনে ছিল একটি ভিন্ন উদ্দেশ্য। মহম্মদ-বিন-কাশিমের সিন্ধু-অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সিন্ধুরাজ দাহিরের বিরুদ্ধে একটি শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া। কারণ সিন্ধু প্রদেশের অন্যতম সমুদ্রবন্দর দেবুলে দাহির একটি আরবীয় জাহাজ দখল করেন এবং তা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু এটাও অনস্বীকার্য যে, হিন্দুধর্মের

পৌত্তলিকতা ও বহু ঈশ্বরবাদকে নির্মূল করে ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাও ছিল এই সব আক্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য। হাজ্জাজকে লেখা মহম্মদ-বিন-কাশিমের একটি চিঠি থেকে জানা যায় ঃ

'রাজা দাহিরের ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁর সেনানী ও প্রধান অফিসারদের খুন করা হয়েছে এবং অবিশ্বাসীদের হয় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে, নয়ত হত্যা করা হয়েছে। পুতুল পুজোর মন্দিরগুলির জায়গায় মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। পবিত্র খুতবা [Kutbah] পাঠ করা হয়েছে, নামাজের জন্য আহ্বান (আযান) জানানো হচ্ছে এবং তা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনা করার জন্য। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র প্রতি তকবির ও স্তুতি নিবেদন করা হচ্ছে।" (ড. টিটাসের ইণ্ডিয়ান ইসলাম, পৃ-১০)

এই সংবাদটির সঙ্গে পাঠানো হয় রাজা দাহিরের ছিন্নমুণ্ড। এর উত্তরে হাজ্জাজ তাঁর সেনাপ্রধানকে জানান ঃ

"উচ্চ হোক কিংবা নীচ হোক যাদেরকে তুমি সুরক্ষা দিয়েছ তাদের মধ্যে শত্রু ও মিত্রের মধ্যে কোনও বৈষম্য করবে না। *এর পরের কথা আলাদা।* খোদা বলেন — নাস্তিকদের বিন্দুমাত্র ক্ষমা না করে তাদের গলা কেটে ফেল। এটাই মহান খোদার আদেশ। সুরক্ষার ক্ষেত্রে বেশি প্রস্তুতির দরকার নেই। কারণ তাহলে তোমার কাজ পিছিয়ে যাবে। একমাত্র উচ্চপদাধিকারী ছাড়া কোনও শত্রুকে ক্ষমা করবে না।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-১০)

গজনির মামুদও তাঁর অসংখ্যবার ভারত আক্রমণকে পবিত্র ধর্মযুদ্ধ বলেই মনে করেছেন। মাহমুদের অভিযান সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ঐতিহাসিক আল উত্বি [Al' Utbi] লিখেছেন, "তিনি মন্দির ধ্বংস করে ইসলামের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অধিকার করেছেন ...... বহু নগর। কলুষিত হতভাগাদেব [polluted wretches] খুন করেছেন এবং পৌত্তলিকদের হত্যা করে মুসলমানদের তুষ্ট করেছেন। 'স্বদেশে ফিরে এসে ইসলামের জন্য অর্জিত গৌরবের মূল্যায়ন করেছেন ....... তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, প্রতি বছর তিনি হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ ঘোষণা করবেন'।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-১১)

ভারত আক্রমণের ক্ষেত্রে মহম্মদ ঘোরিও একই ধরনের ধর্মীয় উন্মাদনায় বিভোর ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক হাসান নিজামি লিখেছেন ঃ

"তিনি তাঁর তরবারি দ্বারা হিন্দুস্থানকে ধর্মীয় অবিশ্বাসের নোংরামো এবং পাপ থেকে মুক্ত করেন ; বহুদেবত্ববাদ ও মূর্তিপুজোর মত অপবিত্রতার কন্টক থেকে দেশকে মুক্ত করেন। তাঁর রাজকীয় সাহসিকতা ও উৎসাহের কারণে একটি মন্দিরও দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-১১)

তৈমুর তাঁর স্মৃতি কথায় ভারত আক্রমণের কারণ উল্লেখ করেছেন এ ভাবে ঃ

"হিন্দুস্তান আক্রমণের ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার নাস্তিকদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা এবং মহম্মদের (তাঁর এবং তাঁর পরিবারের প্রতি খোদার আশীর্বাদ ও শান্তি বর্ষিত হউক) নির্দেশ অনুসারে তাদেরকে(ইসলামের) মহাসত্যে দীক্ষিত

করা, বহুত্ববাদ ও অবিশ্বাসের অপবিত্রতা থেকে দেশটিকে মুক্ত করা এবং সব মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করা। এ কাজ করে খোদার কাছে আমরা গাজি ও মুজাহিদের স্বীকৃতি পাব এবং ইসলামেব (faith) সহযোগী ও সৈনিক হিসাবে মান্যতা পাব।" (লেন পুলের 'মেডিয়েভেল ইণ্ডিয়া', পৃ- ১৫৫)

মুসলমানদের দ্বারা ভারত অভিযানের এই ঘটনাগুলি একদিকে যেমন ছিল ভারতের উপর আক্রমণ অন্যদিকে তেমনি ছিল তাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহ। এই বিশেষ দিকটি অন্ধকারে থেকে গেছে, কারণ আক্রমণকারী সব মুসলমানকে এক সম্প্রদায়ভুক্ত হিসাবে দেখা হয়েছে; তাঁদের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয়নি। আসলে কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন তাতার; কেউ আফগান; আবার কেউ মোঙ্গল। গজনির মামুদ ও বাবর ছিলেন তাতার; মহম্মদ ঘোরি, নাদির-শাহ ও আহম্মদ-শাহ-আবদালি ছিলেন আফগান এবং তৈমুর ছিলেন মোঙ্গল। ভারত অভিযানের সময় আফগানরা তাতারদের এবং মোঙ্গলরা তাতার ও আফগান উভয় সম্প্রদায়কেই ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের বাঁধনে তাঁরা কোন সুখী পরিবারের সদস্য হতে পারেননি। একের সঙ্গে অপরের ছিল মরণমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এক পক্ষের সমূলে বিনাশ সাধন ছিল অন্য পক্ষের কামনা। যা হোক, যেটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে তা হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের প্রচণ্ডতা থাকা সত্ত্বেও হিন্দু ধর্মকে নির্মূল করার ব্যাপারে তাঁরা সবাই ছিলেন ঐক্যবদ্ধ।

মুসলমানদের ভারত আক্রমণের পদ্ধতি ভারতের পরবর্তী ইতিহাসে তাদের আক্রমণের উদ্দেশ্য থেকে কম তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না।

মহম্মদ-বিন-কাশিমের ধর্মোন্মত্ততার প্রথম প্রকাশ ছিল, অধিকৃত দেবুল শহরের ব্রাহ্মণদের খৎনা দেওয়া *('to circumcise') অর্থাৎ পুরুষদের লিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া কেটে ফেলা)*। কিন্তু ধর্মান্তরিতকরণের এই পথ অবলম্বন করতে গিয়ে যখন তিনি বাধা পেলেন তখন ১৭ বছরের বেশি বয়সের সবাইকে হত্যা করলেন এবং নারী ও শিশুসহ বাকি সকলকে ক্রীতদাসে পরিণত করার আদেশ দিলেন। তিনি হিন্দুদের মন্দির লুঠ করলেন এবং বহুমূল্যের লুণ্ঠিত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ, যা সরকারের প্রাপ্য, সরিয়ে রেখে বাকিটা তিনি সৈনিকদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দিলেন।

হিন্দুদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করতে পারে শুরু থেকেই এমন সব পদ্ধতি অবলম্বন করেন গজনির মাহমুদ। ১০০১ খ্রিস্টাব্দে রাজা জয়পালকে পরাজিত করে তিনি আদেশ দেন যে, রাজাকে বন্দী করে যেন "প্রকাশ্য রাস্তা-ঘাটে ঘোরানো হয়, যাতে তাঁর সন্তান-সন্ততি ও সেনাপ্রধানরা তাঁকে এমন লজ্জিত, শৃঙ্খলিত এবং অপমানিত অবস্থায় দেখতে পায় এবং এভাবেই দেশের সর্বত্র বিধর্মীদের মধ্যে ইসলাম ভীতি ছড়িয়ে পড়তে পারে।"

ড. টিটাস তাঁর 'ইন্ডিয়ান ইসলাম' গ্রন্থে (পৃ-২২) বলেছেন —

"বিধর্মীদের খুন করার মত অপকর্ম মাহমুদকে বিশেষ আনন্দ দিত বলে মনে হয়। ১০১৯ খৃঃ চাঁদ রায়ের রাজ্য আক্রমণ করার সময় অসংখ্য বিধর্মীকে হত্যা অথবা বন্দি করা হয়। বিধর্মী এবং সূর্য ও অগ্নি উপাসকদের খুন করে পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত

মুসলমানরা লুণ্ঠিত সম্পত্তির প্রতিও আগ্রহী হত না। ঐতিহাসিকরা এ কথাও সরলভাবে জানিয়েছেন যে, হিন্দু সৈন্যবাহিনীর হাতিগুলিও পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে ইসলামের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে স্বেচ্ছায় মাহমুদের কাছে এসেছিল ইসলাম ধর্মকে সেবা করার জন্য।"

মহম্মদ বখতিয়ার খিল্‌জির বিহার বিজয়ের মতো বিভিন্ন ঘটনায় ব্যাপক হিন্দু নিধনের ফলে হিন্দুদের নিজস্ব সংস্কৃতি ধারাবাহিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাবাকাত-ই-নাসিরির রচনা থেকে জানা যায় মহম্মদ বখতিয়ার খিল্‌জি যখন বিহারের নুডিয়া অধিকার করেন তখন, "বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য বিজয়ীদের হাতে এসেছিল। ওখানকার অধিকাংশ অধিবাসীরাই ছিলেন মুণ্ডিত মস্তক ব্রাহ্মণ। তাঁদেরকে হত্যা করা হয়। সমস্ত শহরে ও দুর্গগুলিতে অনেক বই পাওয়া গেছে। কিন্তু কোনও মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা হয়নি। ফলে বইগুলির বিষয়বস্তু জানা যায়নি।"

মুসলিম আক্রমণ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য একত্রিত করে ড. টিটাস তাঁর উপসংহারে বলেছেন ঃ "মন্দির ধ্বংস ও মূর্তি অপবিত্র করণের ব্যাপারে অনেক তথ্য আমরা পেয়েছি। দেখা গেছে, মহম্মদ-বিন-কাশিম পরিকল্পিত ভাবে সিন্ধু প্রদেশ ধ্বংস করেছেন। কিন্তু মুলতানের একটি বিখ্যাত মন্দির তিনি ধ্বংস করেননি একমাত্র আর্থিক কারণে। কারণ ঐ বিখ্যাত মন্দিরে ভক্তরা বিগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ উপহার দিতেন। কিন্তু নিজের অর্থ লোলুপতা চরিতার্থ করার জন্য মন্দিরটির ক্ষতি না করে বিগ্রহের গলায় এক টুকরো গোমাংস ঝুলিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর বিদ্বেষকেই প্রকাশ করেছেন।

"মিনহাজ-আস্‌-সিরাজ জানাচ্ছেন, বিন কাশিম কম করেও এক হাজার মন্দির ধ্বংস করে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন এবং মন্দির ধ্বংসের উৎসাহে তাড়িত হয়ে সোমনাথ মন্দির লুঠ করে বিগ্রহটিকে চারটি টুকরোয় খণ্ডিত করেন। এর মধ্যে একটি টুকরো গজনির জামে মসজিদে জমা দেন; একটি টুকরো ফেলে রাখেন রাজপ্রাসাদের প্রবেশ পথে। তৃতীয়টি খণ্ডটিকে পাঠান মক্কায় এবং চতুর্থটিকে মদিনায়।" (ড. টিটাসের 'ইন্ডিয়ান ইসলাম', পৃ-২২-২৩)

লেন পুলে বলেছেন গজনির মাহমুদ শপথ নিয়েছিলেন প্রতি বছর বিধর্মী হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। তিনি মূর্তি ধ্বংসের ব্যাপারে এতটুকু ক্লান্তি অনুভব করেননি, যতক্ষণ পর্যন্ত সোমনাথ মন্দির অক্ষত ছিল। শুধুমাত্র এই লক্ষ্যেই তিনি মরুভূমি অতিক্রম করে মুলতান থেকে উপকূলবর্তী আনহালওয়ারা অভিযান করেছেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করে। যুদ্ধ করতে করতেই তিনি এগিয়ে গেছেন যতক্ষণ না সোমনাথ মন্দির দেখতে পেয়েছেন।

লেন পুলের কথায় — "ঐ মন্দিরে এক লক্ষ তীর্থ যাত্রীর মিলিত হওয়ার রীতি ছিল; এক হাজার ব্রাহ্মণ মন্দিরের সেবা ও ধনসম্পদ রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকতেন। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে থাকতেন শত শত গায়ক ও নৃত্যশিল্পী। মন্দিরের ভিতরে ছিল খসখসে পাথরের স্তম্ভ সদৃশ বিখ্যাত লিঙ্গ। নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল মূল্যবান প্রস্তরখচিত ঝাড়বাতির আলোয় মণিমানিক্যখচিত এটি ছিল অপূর্ব দ্যুতিময়। মন্দিরের প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মণরা

সমবেত হয়ে বিদেশি নাস্তিকদের ব্যঙ্গ করে বলতেন যে, প্রভু সোমনাথ তাদের ধ্বংস করে দেবেন। বিদেশীরা এর সব কিছু অগ্রাহ্য করে দেওয়াল টপকে ভেতরে গিয়ে মন্দির আক্রমণ করল। সেবকরা আকুলভাবে দেবতার কাছে মিনতি জানালেন; কিন্তু পাথরের দেবতা নির্বাক হয়ে রইলেন। তাদের বিশ্বাসের খেসারত দিতে গিয়ে পঞ্চাশ হাজার হিন্দু মৃত্যু বরণ করলেন। আর পবিত্র বিগ্রহটি লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল সত্যিকার বিশ্বাসীরা (*মুসলমানরা*)। সবচেয়ে বড় আকারের পাথরটিকে ভেঙ্গে এর টুকরোগুলি বয়ে নিয়ে গিয়ে বিজয়ীর প্রাসাদের শোভা বাড়ানো হল। মন্দিরের দরজাগুলি গজনিতে নিয়ে গিয়ে বসানো হল এবং বিগ্রহচূর্ণকারীদের উপহার দেওয়া হল লক্ষ লক্ষ পাউন্ড মূল্যের ধনসম্পদ।" (লেন পুলের 'মেডিয়েভেল ইণ্ডিয়া', পৃ-২৬)

গজনির মামুদের এই কীর্তিকলাপ পবিত্র ঐতিহ্যে পরিণত হল। মাহমুদের উত্তরসূরীরা ঐতিহ্যটি বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করে গেছেন। ড. টিটাসের বক্তব্য অনুযায়ী ঃ

"গজনির মামুদের অন্যতম উৎসাহী উত্তরাধিকারী মহম্মদ ঘোরি আজমীঢ় দখল করার সময়, বহু মন্দিরের স্তম্ভ ও ভিত্তি ধ্বংস করে মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে সেখানে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম আইন চর্চার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। দিল্লি শহর ও শহর সংলগ্ন অঞ্চলকে মূর্তি ও মূর্তি উপাসকদের হাত থেকে মুক্ত করা হয়। অদ্বিতীয় খোদার সেবকেরা ঈশ্বরের বিভিন্ন মূর্তিসম্বলিত মন্দিরগুলিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন।"

"কথিত আছে, কুতুবুদ্দিন আইবেকও প্রায় এক হাজার মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। একই লেখক জানাচ্ছেন, কুতুবুদ্দিন দিল্লিতে জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। যে সব পাথর এবং সোনা দিয়ে এটিকে অলংকৃত করেন, সেগুলি ছিল হাতির সাহায্যে চূর্ণ করা মন্দিরের প্রস্তর খণ্ড। কোরান থেকে উদ্ধৃত খোদার বাণী মসজিদের দেওয়ালে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। দিল্লির ঐ মসজিদের পূর্ব তোরণ পর্যন্ত যে সব লিপি উৎকীর্ণ আছে তা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ধারাবাহিক ভাবে চলমান ঐ পদ্ধতির মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যাওয়া ২৭-টি মন্দিরের অবশেষ দিয়ে ঐ জামে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

"আমির খসরুর মত অনুসারে, কুতুবুদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত জামে মসজিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্বিতীয় একটি মিনার নির্মাণ করতে আলাউদ্দিন শুধুমাত্র পাহাড় কেটেই পাথর আনেননি, বিধর্মীদের মন্দিরও ধ্বংস করে পাথর এনেছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তীরা যেমন উত্তর ভারতের মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, দক্ষিণ ভারত অভিযানে আলাউদ্দিনও একই পদ্ধতি অবলম্বন করেন।"

"যে সব হিন্দু নতুন করে মন্দির নির্মাণের সাহস দেখাত, সুলতান ফিরোজ শাহ তাঁদের কী ভাবে শায়েস্তা করতেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে তাঁর 'ফতুয়াহাটে'। পয়গম্বরের আইন অমান্য করে তারা (হিন্দুরা) দিল্লী শহর বা তার কাছাকাছি যে সব মন্দির নির্মাণ করত ঐশী শক্তির নির্দেশে আমি তা ধ্বংস করে দিয়েছি। আমি ঐ ধর্মীয় নেতাদের হত্যা করেছি। অন্যান্যদের বেত মেরে শাস্তি দিয়েছি যতক্ষণ না এই পাপের

কাজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়েছে। যে সকল জায়গায় অবিশ্বাসী এবং পৌত্তলিকগণ পুতুল পুজো করত, সে সকল জায়গায় খোদার অনুগ্রহে মুসলমানরা এখন আসল সৃষ্টিকর্তার উপাসনা করছেন।" (ড. টিটাসের 'ইণ্ডিয়ান ইসলাম', পৃ-২৩-২৪)

এমন কি শাহজাহানের রাজত্বকালেও হিন্দুরা যে সকল মন্দিরের পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করেছিলেন সেগুলি ধ্বংস করার কথা আমরা পড়ে থাকি। হিন্দুদের ঈশ্বরভক্তির উপর এরূপ সরাসরি আক্রমণের সুনিপুণ বিবরণ আছে বাদশাহ্‌নামাতে ঃ

"ঐতিহাসিক বলছেন — মহান সম্রাট আকবরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই তথ্য তাঁকে জানানো হয়েছিল যে, আকবরের রাজত্বের শেষভাগে অবিশ্বাসীদের শক্তিশালী কেন্দ্র কাশীতে অনেক মন্দির নির্মাণ শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণ হয়নি। এখন হিন্দুরা সেগুলির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করতে আগ্রহী। ইসলামের (Faith) রক্ষক মহান বাদশাহ্ আদেশ দিলেন, কাশী এবং তাঁর সাম্রাজ্যের অন্যত্র যে সকল মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে তার সবগুলিকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এলাহাবাদ প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, এই আদেশবলে কাশী জেলাতেই ৭৬-টি মন্দির ধ্বংস করা হয়।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-২৪)

পৌত্তলিকতা বিলুপ্তির চূড়ান্ত দায়িত্ব বর্তায় ঔরঙ্গজেবের উপর। 'মা আথির-ই-আলমগিরি' গ্রন্থের লেখক হিন্দু শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং হিন্দু মন্দির ধ্বংসের ব্যাপারে ঔরঙ্গজেবের প্রচেষ্টার বিবরণ দেন এ ভাবে ঃ

'১৬৬৯ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ঔরঙ্গজেব জানতে পারেন যে, থাট্টা, মুলতান এবং বিশেষত কাশীতে মূর্খ ব্রাহ্মণরা তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থহীন তুচ্ছ কিছু গ্রন্থ নিয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন এবং দূর দূরান্ত থেকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা সেখানে যাচ্ছেন ........। 'বিশ্বাসের (*ইসলামের*) কর্ণধার' বাদশাহ্ সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে এই মর্মে আদেশ দিলেন অবিশ্বাসীদের ঐ সব বিদ্যালয় ও মন্দির যেন কঠোর হাতে ধ্বংস করা হয়। ফলে ঐ শাসনকর্তারা সমষ্টিগতভাবে পৌত্তলিকতার শিক্ষা ও আচরণকে সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ করে দেন। ...... পরে মহান ধর্মরক্ষককে (His Religious Majesty) জানানো হয় যে, সরকারী কর্মচারীরা কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করে দিয়েছেন।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-২২)

ড. টিটাসের মতে, "মনে হয় মাহমুদ বা তৈমুরের মতো আক্রমণকারীরা জোর করে ধর্মান্তরিত করা অপেক্ষা মন্দির ধ্বংস, ধনসম্পদ লুঠ করা, বন্দীদের ক্রীতদাসে পরিণত করা এবং 'ধর্মান্তরকরণের তরবারির' সাহায্যে অবিশ্বাসীদের নরকে পাঠানো নিয়ে বেশি ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু স্থায়ীভাবে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর ধর্মান্তরকরণের প্রতি চূড়ান্ত গুরুত্ব এসে পড়ে। ধর্ম হিসেবে দেশের সর্বত্র ইসলামকেই প্রতিষ্ঠিত করা তখন রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

"মন্দির ধ্বংসের কাজে কুতুবুদ্দিন ছিলেন মাহমুদের প্রায় সমকক্ষ। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ধর্মান্তরকরণের ব্যাপারে তিনি অতি অবশ্যই বলপ্রয়োগকে হাতিয়ার (incentive) হিসেবে ব্যবহার করেন। একটি নমুনা

হলঃ

১১৯৪ খৃঃ যখন তিনি কৈল (আলিগড়) অভিযান করেন, তখন দুর্গরক্ষাকারী সৈনিকদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও চতুর ছিল তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। অন্যান্য সকলকে হত্যা করা হয়।

"বলপ্রয়োগে ধর্মপরিবর্তন করার ক্ষেত্রে চরমতম ব্যবস্থা গ্রহণের আরও ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে (১৩৫১-১৩৮৮) এরকম একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী হল ঃ 'এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, তিনি তাঁর বাড়িতে মূর্তিপুজো করেন এবং এমনকি গণ্যমান্য মুসলমান রমণীরাও এর ফলে অবিশ্বাসী হয়ে যাচ্ছেন। বিচারক, চিকিৎসক, বয়োজ্যেষ্ঠ ও আইনজীবীদের দরবারে তাঁকে বিচারের জন্য পাঠানো হল। তাঁরা সবাই এক বাক্যে বললেন, এক্ষেত্রে আইনের নির্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট। ব্রাহ্মণকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে, অথবা তাঁকে পুড়িয়ে মারা হবে। কোনটি সত্য ধর্ম ব্রাহ্মণকে তা বুঝিয়ে দেওয়া হল এবং সঠিক পথ কি তাও বোঝানো হল। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণ ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। ফলশ্রুতি হিসাবে সুলতানের আদেশে তাকে পুড়িয়ে মারা হল। বর্ণনাকারী বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করছেন — 'দেখুন, সুলতান আইনের প্রতি এতটা নিষ্ঠাবান ও শ্রদ্ধাশীল যে তিনি তাঁর নির্দেশ থেকে এক চুলও সরে এলেন না'।"

মাহমুদ শুধু মন্দির ধ্বংস করেই থামেননি, পরাজিত হিন্দুদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করাকে তাঁর নীতি হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। ড. টিটাসের ভাষায় ঃ

'ভারতের সঙ্গে ইসলামের যোগসূত্র স্থাপনের প্রথম পর্বে, আমরা শুধু অবিশ্বাসীদের হত্যা ও তাদের মন্দির ধ্বংসই দেখিনি, অনেক অনেক বন্দীকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে দেখেছি। বিভিন্ন অভিযানে নেতা ও সাধারণ সেনাবাহিনীর কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ঘটনা ছিল লুঠের মাল ভাগাভাগির ব্যাপার। বিধর্মীদের হত্যা, তাদের মন্দির ধ্বংস, বন্দীদের দাসে পরিণত কবা ও সাধারণের বিশেষত মন্দিরের এবং পূজারীদের সম্পদ লুণ্ঠন করা ছিল মাহমুদের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রথমবার অভিযানে তিনি প্রচুর লুণ্ঠিত সম্পদ আত্মসাৎ করেন। এছাড়া প্রায় পাঁচ লক্ষ সুদর্শন মহিলা ও পুরুষকে দাস হিসাবে গজনিতে পাঠিয়ে দেন।" (ড. টিটাসের 'ইণ্ডিয়ান ইসলাম', পৃ-২৪)

পরবর্তীকালে ১০১৭ খৃঃ মাহমুদ যখন কনৌজ অধিকার করেন, তখন তিনি এত অর্থ সংগ্রহ করেন যে, যাঁরা ঐ বিপুল অর্থ গণনা করেছিলেন, তাঁদের আঙুলগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ১০১৯ খৃস্টাব্দের অভিযানের পরে গজনি ও মধ্য এশিয়াতে কিভাবে ভারতীয়দের ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছিল, সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বিবরণীতে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

" বন্দীদের সংখ্যা কত বেশি তা বোঝা যাবে এই ঘটনা থেকে যে, মাত্র দুই থেকে দশ দিরহাম মূল্যে একজন বন্দীকে বিক্রি করা হত। পরে এদের গজনিতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে দূর দূরান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা তাদের কিনতে আসতেন। ....... সুদর্শন কিংবা কুশ্রী, গরীব কিংবা ধনী সবাইকে একই শ্রেণির দাস হিসাবে গণ্য করা হত।

"১২০২ খৃঃ যখন কুতুবউদ্দিন কালিঞ্জর দুর্গ অধিকার করেন তখন মন্দিরগুলিকে মসজিদে পরিণত করা হয়, পৌত্তলিকতার নামটি পর্যন্ত নির্মূল করা হয় এবং পঞ্চাশ হাজার হিন্দুকে দাসে রূপান্তরিত করা হয়। এবং হিন্দুদের উপস্থিতিতে সমতল এলাকা পিচের ন্যায় কালো হয়ে যায়।" (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-২৬)

পবিত্র যুদ্ধে পরাজিত হিন্দুদের অদৃষ্ট ছিল দাস জীবনযাপন। কিন্তু যুদ্ধবিহীন স্বাভাবিক অবস্থায়ও মুসলমান আক্রমণকারীদের গৃহীত ব্যবস্থা অনুসারে হিন্দুদের মর্যাদাহানির ধারাবাহিকতা কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে হিন্দুরা কোনও কোনও অঞ্চলে সুলতানকে বিব্রত করছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁদের উপর এমন ভাবে অতিরিক্ত করের বোঝা চাপালেন যাতে তাঁরা বিদ্রোহ করতে না পারেন।

"হিন্দুদের পক্ষে ঘোড়া পালন বা ঘোড়ায় চড়া, অস্ত্র-শস্ত্র বহন করা, সৌখিন জামাকাপড় ব্যবহার করা এবং কোন প্রকার বিলাসী জীবনযাপন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।"

জিজিয়া কর প্রবর্তন করা প্রসঙ্গে ড. টিটাস বলছেন ঃ —

"হিন্দুদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায়ের আইনটি চালু ছিল কেবলমাত্র তত্ত্বগত ভাবে। তবুও সকল সুলতান, সম্রাট ও রাজাদের রাজত্বে ভারতের বিভিন্ন অংশে হিন্দুদের ওপর এই কর চাপিয়ে দেওয়া হত প্রায় নিয়মিত ভাবে। কারণ আইন কার্যকর করার বিষয়টি নির্ভর করত কেবলমাত্র শাসকদের ক্ষমতার উপর। আটশ' বছরেরও বেশি সময় ধরে এই নীতি মুসলমান শাসনব্যবস্থার মৌলিক অংশ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল এবং চালু ছিল। অবশ্য আকবরের গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বের নবম বছরে (১৫৬৫ খৃঃ) তার শাসনাধীন এলাকায় সর্বত্র এই কর প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল।"

লেন পুলে বলেছেন, "একজন হিন্দুকে কর হিসাবে তার জমিতে উৎপন্ন মোট ফসলের অর্ধেক দিতে হত। তাদের মহিষ, ছাগল এবং অন্যান্য দুগ্ধ প্রদানকারী গবাদি পশুর জন্যও শুল্ক দিতে হত। জমির পরিমাণ ও গবাদি পশুর সংখ্যার ওপর, ধনী-দরিদ্র সকলকে সমহারে কর দিতে হত। কর আদায়কারী কোন রাজকর্মচারী উৎকোচ নিলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করা হত এবং লাঠি, সাঁড়াশি, দেহ টান টান করে শাস্তি দেওয়ার যন্ত্র, কারাদণ্ড এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। নতুন আইনগুলি এত কঠোরভাবে চালু ছিল যে, এক একজন রাজস্ব আদায়কারী ২০ জন বিশিষ্ট হিন্দুকে এক সঙ্গে বেঁধে এনে প্রহারের মাধ্যমে পাওনা আদায় করতে পারতো। হিন্দুদের বাড়িতে সোনা, রূপো, এমন কি চিত্ত বিনোদনের জন্য সামান্য পানও দেখা যেত না। দুঃস্থ হিন্দু কর্মচারীদের স্ত্রীরা মুসলমান পরিবারে দাসীবৃত্তি করতে বাধ্য হত। রাজস্ব-আদায়কারীরা ছিল প্লেগ রোগের চেয়েও ভয়ঙ্কর। সরকারী কেরাণীর চাকুরী মৃত্যুর চেয়েও অবমাননাকর বলে বিবেচিত হত এবং তাদেরকে এতটাই ঘৃণার চোখে দেখা হত যে, কোন হিন্দু তাদের সঙ্গে মেয়েদের বিয়ে দিতেন না।" (লেন পুলের 'মেডিয়েভেল ইণ্ডিয়া', পৃ-১০৪)

সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের মতে এই অনুশাসন "এমন কঠোর ভাবে পালিত হত যে চৌকিদার, খুত এবং মুকাদ্দিম ইত্যাদি কর্মচারীরা ঘোড়ায় চড়তে পারতেন না, অস্ত্র ব্যবহার করতে পারতেন না, সুন্দর মিহি কাপড় পরতে পারতেন না। এমনকি পান খেতেও পারতেন না। কোন হিন্দুকে মাথা তুলতেই দেওয়া হত না। .... কর আদায় না হলে, শারীরিক নির্যাতন, পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখা, জেলে পুরে দেওয়া ও শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা সহ সব রকমের শাস্তি প্রয়োগ করা হত।

এ সব কাণ্ড কিন্তু শুধুমাত্র হিংসা ও নৈতিক বিকারের ফল ছিল না। পক্ষান্তরে, যা করা হয়েছিল, বৃহত্তর ক্ষেত্রে তা ইসলাম-প্রবক্তাদেব (leaders of Islam) দেশ শাসনের চিন্তা-চেতনা অনুসারেই করা হয়েছিল। এই চিন্তা-চেতনা খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সুলতান আলাউদ্দিনের কাজী (*মুগিসউদ্দিন*)। মুসলিম শাসনে হিন্দুদের আইনসম্মত অবস্থান কী, সুলতান তা জানতে চেয়েছিলেন ঐ কাজীর কাছে। উত্তরে কাজী বলেছেন ঃ—

'তাদের (হিন্দুদের) অধিকার শুধু শ্রদ্ধা নিবেদন করার। রাজস্ব-আদায়কারীরা তাদের কাছে যখন রূপো দাবী করবেন, হিন্দুরা তখন বিনা প্রশ্নে এবং সর্বোচ্চ নম্রতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সোনা দেবে। রাজকর্মচারী যদি তাদের মুখে নোংরা (dirt) পুড়ে দেয়, বিন্দুমাত্র আপত্তি ছাড়াই হিন্দুরা তা গ্রহণ করবে বড় করে মুখ 'হা' করে। ...... জিম্মিদের কাছে (*অর্থাৎ হিন্দুদের কাছে*) প্রাপ্য এই সামান্য পাওনা আদায়ের দ্বারা এবং তাদের মুখে নোংরা নিক্ষেপের দ্বারা ওদের যথাযথ আনুগত্য প্রমাণিত হবে। ইসলামের মহিমা প্রচার একটি কর্তব্য। আর (ইসলাম) ধর্মের অবমাননা করা হচ্ছে পাপ। খোদা তাদের ঘৃণা করেন, যার জন্য তিনি বলেন — 'ওদের পদানত করে রাখো'। হিন্দুদের মর্য্যাদাহীন করে রাখা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একটি কর্তব্য। কারণ তারা হচ্ছে পয়গম্বরের সবচেয়ে ঘৃণিত শত্রু; যে কারণে পয়গম্বর তাদেরকে হত্যা, লুণ্ঠন ও বন্দী করে রাখার আদেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদের বলেছেন — 'হয় তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য কর, অথবা তাদের হত্যা কর। তাদের দাস করে সমস্ত ধনসম্পত্তি ধ্বংস করে দাও।' একমাত্র ধর্মবেত্তা হানিফা, আমরা যার মতবাদ অনুসরণ করি, হিন্দুদের ওপর জিজিয়া প্রয়োগ করতে আদেশ দিয়েছেন (*তাদের বেঁচে থাকার বিনিময়*)। অপর ধর্মবেত্তাগণ বলেছেন; হিন্দুদের 'ইসলাম ধর্মগ্রহণ অথবা মৃত্যু' ছাড়া কোন বিকল্প নেই।"

এই হল গজনির মাহমুদের আগমন ও আহম্মদ-শাহ্-আবদালির প্রত্যাবর্তনের মধ্যবর্তী ৭৬২ বছরের ইতিহাস।

# উদ্ধৃতির মূল বয়ান এবং উৎস

[Text of The Quotations. All taken from Dr. Ambedkar's 'Pakistan or The Partition of India, Published by The Govt. of Maharastra in 1990]

১) "The religious tie of Islam is the strongest known to humanity." (Chapter-III, page-216)

২) "The brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is brotherhood of Muslims for Muslims only. There is a fraternity but its benefit is confined to those within that corporation. For those who are outside the corporation, there nothing but contempt and enmity." (Chapter-XII, page-330)

৩) "In the religious field, the Hindus draw their inspiration from the Ramayan, the Mahabharat, and the Geeta. The Musalmans on the other hand, derive their inspiration from the Quran and the Hadis. Thus, the things that divide are far more vital than the things which unite." (Chapter-II, page-36)

৪) "It should be admitted that every possible attempt to bring about union between Hindus and Muslims has been made and that all of them have failed." (Chapter-XII, page-305)

৫) "The riots are a sufficient indication that gangsterism has become a settled part of their (Muslim's) strategy in politics." (Chapter-XI, page-269)

৬) "According to Muslim Cannon Law the world is divided into two camps, Dar-ul-Islam (abode of Islam) and Dar-ul-Harb (abode of war). A country is Dar-ul-Islam when it is ruled by Muslims. A country is Dar-ul-Harb when Muslims only reside in it but are not rulers of it. That being the canon Law of the Muslims, India cannot be the common motherland of the Hindus and the Musalmans. It can be the land of the Musalmans-but it cannot be the land of the 'Hindus and the Musalmans living as equals'. Further, it can be the land of the Musalmans only when it is governed by the Muslims. The moment the land becomes subject to the authority of a non-Muslim power, it ceases to be the land of the Muslims. Instead of being Dar-ul-Islam it becomes Dar-ul-Harb." (Chapter-XII, page-294)

৭) "The history of the last 30 years shows that Hindu-Muslim unity has not been realized." (Chapter-XII, page-313)

৮) "To the Muslims a Hindu is a Kaffir. A Kaffir is not worthy of respect. He is low-born and without status. That is why a country which is ruled by a Kaffir is Dar-ul-Harb to a Musalman. Given this,

no further evidence seems to be necessary to prove that the Muslims will not obey a Hindu government." (Chapter-XII, page-301)

৯) "A safe Army is better than a safe border." (Chapter-V, page-101)

১০) "The army in India must necessarily be a mixed army composed of Hindus and Muslims. If India is invaded by a foreign power, can the Muslims in the army be trusted to defend India? Suppose invaders are their co-religionists. Will the Muslims side with the invaders or will they stand against them and save India?" (Chapter-XIII, page-364)

১১) "If they *(Muslim Army)* are infected *(by the poison of Two Nation theory)*, then the army in India cannot be safe. Instead of being the guardian of the independence of India, it will continue to be a **menace and a potential danger to its independece."** (Chapter-XI, page-364)

১২) "Rightly or wrongly, most people suspect that Pakistan is pregnant with mischief. They think that it has two motives, one immediate, the other ultimate. The immediate motive, it is said, is to join with the neighbouring Muslim countries and form a Muslim Federation. The ultimate motive is for the Muslim Federation to invade Hindustan and conquer or rather re-conquer the Hindu and re-establish Muslim Empire in India." (Chapter-XIV, page-376)

১৩) "...... they *(Hindus and Muslims)* must remain divided. There is nothing to bring them in one bosom." (Chapter-VII, page-193)

১৪) "There is another injunction of Muslim Canon Law called Jihad (crusade) by which it becomes "incumbent on a Muslim ruler to extend the rule of Islam until the whole world shall have been brought under its sway. The world, being divided into two camps, Dar-ul-Islam (abode of Islam), Dar-ul-Harb (abode of war), all countries come under one category or the other. Technically, it is the duty of the Muslim ruler, who is capable of doing so, to transform Dar-ul-Harb into Dar-ul-Islam." (Chapter-XII, page-295)

শ্রীএন. সি. দে-র লেখা থেকে

(সৌজন্যে ঃ 'স্বস্তিকা', ১৯ এপ্রিল, ২০১০, পৃ-৩)

"এটা অবাক করার মতো ঘটনা যে হিন্দুস্থানে গরীব অনগ্রসর হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা ঋণের ক্ষেত্রে ১০-১২ শতাংশ হারে সুদ দেবে, আর মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা সুদ দেবে মাত্র ৩ শতাংশ হারে। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের মাইনরিটি ফিনান্স কর্পোরেশন সংখ্যালঘুদের ৫০০ কোটি টাকার ঋণ মুকুব করে দিয়েছে। .... কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার পুনরায় ক্ষমতা দখলে রাখার স্বার্থে ২০০৮ সালে পেশ করা বাজেটে .. সংখ্যালঘু উন্নয়নের স্বার্থে ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। ২০০৯ সালের বাজেটে এই বরাদ্দের পরিমাণ বেড়ে হয় ১৭৪০ কোটি টাকা .... পশ্চিবঙ্গের মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলা ও কেরলের মাল্লপুরমে একটি করে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস গড়ার জন্য ক্যাম্পাস প্রতি ২৫ কোটি টাকার বরাদ্দ। ... এবারে আরও স্পষ্ট করে ৯০-টি জেলাকে মুসলিম অধ্যুষিত বলে ঘোষণা করে উন্নয়ন করা হবে। আহাম্মক, অপরিণামদর্শী হিন্দু নেতৃবৃন্দের কাছে বর্তমানে কাশ্মীরের এবং অবিভক্ত ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও পুনরায় হিন্দুস্থানের মধ্যেকার জেলাগুলিকে সংখ্যালঘু মুসলিম অধ্যুষিত হিসাবে চিহ্নিত করে দিয়ে কী পরিণতির দিকে দেশকে নিয়ে যাচ্ছে তা ভবিষ্যতই বলতে পারবে।"

*আমাদের মন্তব্য ঃ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম স্রষ্টা এবং মুসলিম লীগের অন্যতম উদ্যোক্তা-প্রতিষ্ঠাতা মহামান্য আগা খান* ***[His Highness Aga Sir Sultan Mahomed Shah Aga Khan,G.C.I.E., Bombay]*** *তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন, " স্বাধীন পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়েই।"* মোহিত রায়ের 'অনুপ্রবেশ, অস্বীকৃত উদ্বাস্ত ও পশ্চিমবঙ্গের অনিশ্চিত অস্তিত্ব', ২০০৯, পৃ-২৭

শ্রীমতি এষা দে-র লেখা থেকে —

(সৌজন্যে ঃ 'স্বস্তিকা', ১৯ এপ্রিল, ২০১০, পৃ-৪)

" যে রাজ্যে একজন উচ্চ শিক্ষিত মেধাবী মুসলমান ভারত সরকারের সর্বোচ্চ চাকরি করে অবসর জীবনে একটি প্রসিদ্ধ ইংরেজী দৈনিকে নিবন্ধ লিখে নিজেকে সগর্বে মৌলবাদী ঘোষণা করেন এবং কোন মুসলমান তাঁকে সমালোচনার সাহস ধরেন না, সে রাজ্যে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতাই স্বাভাবিক কারণ, এটা একটা হাতিয়ার। লক্ষ্য উন্নয়ন নয়, আধিপত্য স্থাপন।"

"সঠিকভাবেই হোক আর ভুলক্রমেই হোক, বিরাট সংখ্যক মানুষ মনে করেন যে, পাকিস্তান দুষ্টবুদ্ধিতে ভরপুর। তাদের মতে পাকিস্তান সৃষ্টির উদ্দেশ্য দু'টি — একটি প্রাথমিক এবং অপরটি খানিকটা দূরবর্তী। প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি মুসলিম যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা। এবং পরবর্তী উদ্দেশ্য হচ্ছে হিন্দুস্থানকে (ভারতকে) আক্রমণ করে হিন্দুদের জয় বা পুনর্জয় করা এবং শেষ পর্যন্ত ভারতকে মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করা।"

— ড. বি. আর. আম্বেদকর।

"মাদ্রাসা থেকে যে লাখ লাখ ছেলে মেয়েরা বেরুচ্ছে তারা তো পঙ্গু, .... বাঙালী জাতির জন্য ভয়ঙ্কর। কারণ তাদেরকে এই শিক্ষা দিয়ে বের করা হচ্ছে, মুসলমান হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। সে মুসলমান খুন করুক, ধর্ষণ করুক, রাহাজানি করুক, তবুও সে শ্রেষ্ঠ। মুসলমান বলেই শ্রেষ্ঠ। ... যে মুসলমান নয়, সে কাফের। কাফের হত্যা করলে পাপ নেই। বরং পুণ্য। বেহেস্ত কাফের হত্যাকারীর জন্য উন্মুক্ত। এ সবই তো শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে মাদ্রাসাগুলোতে।"

— সালাম আজাদ, বাংলাদেশ।

"এই রাজ্যে হাজার হাজার মাদ্রাসায় যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় সেই অর্থ কোথা থেকে আসে? ... এ তো সকলের জানা গোপন তথ্য যে, সৌদি আরব এবং জঙ্গি সংগঠনগুলো থেকে প্রাপ্ত মোট অর্থেই বহু মাদ্রাসার তহবিল স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়। এই মাদ্রাসায় বাইরে থেকে কি শুধু অর্থই আসে, সঙ্গে প্যান ইসলামিজমের মন্ত্র আসে না?"

— গিয়াসুদ্দিন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

"মুসলিম ধর্মের প্রভাবে ধর্মান্তরিত ভারতীয়রা তাদের পূর্ব পুরুষদের জাতীয়তা বোধ থেকে নিজেদের পৃথক করে নিতে শিখল। আরব দেশকে একান্ত আপন ভেবে এরা মক্কার গুণগান শুরু করল। যা কিছু ভারতীয় এবং ভারতের গৌরবের তাই ঘৃণিত হতে থাকল। আরবে অবস্থিত ইসলামের উপাসনালয়গুলি উৎকৃষ্ট এবং এদেশের উপাসনালয়গুলি নিকৃষ্ট মনে করতে থাকল। ... দারিদ্র্য আর অভাবক্লিষ্ট মানুষগুলি — ধর্মপ্রদত্ত বেহেস্‌তের স্বপ্ন বিলাস নিয়ে আজও দিনযাপন করছে। এখন সময় এসেছে ধর্ম ব্যবসায়ীদের ভেবে দেখবার, তারা তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কী ক্ষতি করে যাচ্ছে।

— এম এ সফিউল্লাহ্। পঃ বঃ।